রানী কাহিনী

পাঁচটি রানী কাহিনী

ড. দীপক চন্দ্র

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

RANI KAHINI
by DR. DIPAK CHANDRA
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা মাঘ ১৩৪৪

প্রচ্ছদ : দেবদত্ত নন্দী

দাম : ২০০ টাকা

ISBN 81-295-0043-4

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার সেটিং : লোকনাথ লেজারোগ্রাফার
৪৪এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

আমার পুত্রবধূ

জয়ন্তী-কে

কল্যাণীয়াসু—

লেখকের অন্যান্য বই

উপন্যাস

অগ্নিগর্ভ খান্ডব
শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম
ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণ
শ্রীকৃষ্ণ এলেন দ্বারকায়
বিষণ্ণ শ্রীকৃষ্ণ
যদি রাধা না হ'ত
কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন
লঙ্কেশ রাবণ
জননী কৈকেয়ী
উর্বশী জননী
রামের অজ্ঞাতবাস
কাশ্যপেয়
মহাবিশ্বে মধুকৈটভ
তোমারই নাম কর্ণ
পিতামহ ভীষ্ম
রাজা রাম
এবং অশ্বত্থামা
সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
গান্ধারী, কুরুক্ষেত্রের গান্ধারী
কৃষ্ণস্তু ভগবান
আশ্রমকন্যা শকুন্তলা
মহাভারতে শকুনি
আমি তোমাদেরই সীতা
দ্রৌপদী চিরন্তনী
কৃষ্ণ অর্জুন সংবাদ
দ্বৈপায়নে দুর্যোধন
মন বৃন্দাবন
সম্রাজ্ঞী কুন্তী
উপেক্ষিতা শূর্পনখা
শ্রীকৃষ্ণ সুন্দরম্
বিভীষণ
অচেনা ভরত
নিবেদিত মার্গারেট
নিবেদিত নিবেদিতা
ভারততীর্থে নিবেদিতা
বিদ্রোহিণী নিবেদিতা
আদম ইভ

ভ্রমণ কাহিনী

নীরব প্রাণের দেবতা

গল্পের বই

গল্পের দুপুর
অমৃতকুম্ভ
যোজনগন্ধা সত্যবতী
পৌরাণিক প্রেমকথা
কাকতালীয়
কুন্তীর তর্জনী
পুণ্যের আলো

সমালোচনা

বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা
সুধা সাগরতীরে
মনোজ বসু : জীবন ও সাহিত্য

সম্পাদনা

হরিবংশ
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণ
মনোজ বসুর রচনাবলী (৪ খণ্ড)
মনোজ বসুর কবিতা

সূচী

রামায়ণ

জননী কৈকেয়ী ... ৯

উপেক্ষিতা শূর্পণখা ... ১৩৫

মহাভারত

যোজনগন্ধা সত্যবতী ... ২২৩

সম্রাজ্ঞী কুন্তী ... ২৫৫

দ্রৌপদী চিরন্তনী ... ৩৬৩

F:/PMS/DEY52.PMS P2 [28]

প্রাসঙ্গিক

আলাদা আলাদা মনের এবং স্বভাবের পাঁচটি নারীকে নিয়ে মৎলিখিত যে পাঁচটি উপন্যাস আছে সেগুলি একত্রিত করে 'রানী কাহিনী' প্রকাশিত হল। রামায়ণ মহাভারতের প্রধান-অপ্রধান নারীচরিত্র নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলো নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য নিয়ে পৃথক পৃথক ফ্রেমে বাঁধান এক একটি নারী। চিরদিনের নারী। এঁরা কেউ সাধারণ নারী ছিলেন না। প্রত্যেকেই রানী। এঁদের সকলকে এক ফ্রেমের অন্তর্ভুক্ত করে, পাশাপাশি রেখে তাদের অর্ন্তপ্রকৃতির ইতিহাস অন্বেষণ করা এবং নারী মনের স্বরূপ আবিষ্কার করা, অনুভব করার এক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে।

পাঁচটি রানীর মধ্যে একটা অভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকের মনে দ্বেষ, বিদ্বেষ, ঘৃণা, প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে। সকলে চায় একটা বিরাট বঞ্চনার প্রতিশোধ নিতে। তাদের আহত ও অপমানিত নারী ব্যক্তিত্ব প্রতিহিংসার হিংস্র শার্দুলের মত ফুঁসছে। তাদের শুভ্র, নির্মল মাতৃত্ব রাজনীতির শিকার হওয়ার জন্যই প্রতিহিংসার অনল সৃষ্টি হয়েছে তাদের বুকে। সে আগুনে তাদের ঘর পুড়েছে, বংশ ধ্বংস হয়েছে, রাজ্য শ্মশান হয়ে গেছে। তবু সেজন্য একটুও অনুতাপ কিংবা দুঃখ নেই তাদের অন্তরে।

কার্যত এরাই দুই মহাযুদ্ধের ইন্ধন যুগিয়েছে। লঙ্কাযুদ্ধ এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পিছনে এদের নেপথ্য ক্রিয়াকলাপই প্রধান। এঁরা না হলে এই দুই মহাযুদ্ধ হত না। মহাকাব্যের এই পঞ্চকন্যাকে একত্র করে নারীহৃদয়ের দুরবগাহ কুটিল ও জটিল মানসিক ক্রিয়াকলাপের এক দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে নারী সম্পর্কিত মূল্যবোধ এবং প্রথাগত ভাবনা-চিন্তা, সংস্কার ও ভাবাদর্শের বাইরে এসে আমার নারী সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার ওপর আলো ফেলেছি। তার ফলে, আমার সৃষ্ট নারীরা পুরানের নারীদের থেকে অনেক বেশি স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণা, আত্মনির্ভরশীল এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্না। পুরুষের করুণা, কৃপা, দয়ার ওপর তারা নির্ভর করে না। তাই আমার কোনো নারী চরিত্র স্বাধিকার বঞ্চিতা নয়। নারী সম্পর্কিত এই বোধ সংকীর্ণ দেশকালের সীমানায় আটকে থাকেনি। আমার ধারণা মহাকাব্যকার এবং পুরাণকাররা নারী মুক্তির বিরোধী। সুতরাং নারীকে তাঁদের ফ্রেমে বন্দী রাখতে হবে, এই যুক্তিতে আমি বিশ্বাসী নই। ফ্রেম পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে নতুন ফ্রেমে তারও বিন্যাস নতুন হয়েছে ভাবে ও নতুন রূপে। কারণ, কোনো মূল্যায়নই চিরকালের মত হয়ে যায় না। কালে কালে সে নতুন হয়ে ওঠে। এক নতুন সত্যের আলো পড়ে চরিত্রগুলি এক নতুন যুগের সন্ধান দেয়।

বলাবাহুল্য, আমার সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলো পৌরাণিক পরিমন্ডলে বাস করে কিন্তু তাদের বাসস্থান এযুগের মাটিতে। কারণ তাদের সত্তাটিকে পুরনো ভূখন্ডের মধ্যে ধরে না। সেখান থেকে তারা নিজেরাই বেরিয়ে এসে মিশে গেছে একবিংশ শতাব্দীর জীবনস্রোতে। একারণেই বামপন্থী কবি, সমালোচক ও অধ্যাপক তরুণ সান্যাল মুক্ত কণ্ঠে বলেছেন, "দীপক চন্দ্র মৌলবাদের শত্রু।" একথা বলার তাৎপর্য হল, মৌলবাদী ভাবাদর্শ হল বন্দী করার ভাবাদর্শ। মুক্তচিন্তার বিপক্ষে। মৌলবাদ মানুষের বিকাশের

বিরোধী। মৌলবাদ হল পীড়নবাদ। সেই পীড়নের লক্ষ্য ধর্ম ও নারী। মৌলবাদের ঘেরাটোপ থেকে পুরানের নারী চরিত্রগুলি মুক্তি দিয়েছি। তাই, পুরানের নারী চরিত্রগুলি পুনঃনির্মাণের সময় আমার মধ্যে সচেতনভাবে যে বোধটি কাজ করেছে তা হল অতীত বিরোধিতা। তাই আমার নারী চরিত্রগুলি একালের নারীমনের দোসর হয়ে পাঠক পাঠিকার মন কেড়ে নিয়েছে।

প্রসঙ্গত, আরো কয়েকটা কথা বলার আছে। রামায়ণ মহাভারতের নারী কনসেপ্টকে আমূল বদলে দিয়েছি। পুরাণে ও মহাকাব্যে নারীকে নারী করে রেখেছে। অন্তঃপুরে তারা বন্দী, তাদের নিজের কোনো অধিকার ছিল না। তাদের নারী হয়ে উঠতে দেয়া হয়নি। কিন্তু আমার উপন্যাসে নারী পুরুষের খেলার পুতুল নয়, আবার তার শয্যাসঙ্গিনীও নয়। পুরুষের সে বন্ধু, সহধর্মিনী, জীবন ও কর্মের সঙ্গিনী, তার পথপ্রদর্শক, তার আদর্শ মন্ত্রণাদাতা এবং বিশ্বস্ত সহযোদ্ধা। পুরুষের সঙ্গে নারীর কোনো তফাৎ নেই। অর্থাৎ নারী-পুরুষের সীমারেখাটা আমি মুছে দিয়েছি। গন্ডীটা না থাকার জন্য উভয়ে অমৃতের পুত্রকন্যা, উভয়ে মানব সন্তান। অধিকারটাও সমান সমান। শ্রদ্ধা, প্রেম, বিশ্বাস, ভালবাসার ওপর গড়ে উঠেছে তাদের আসল সম্পর্কটা। পুরুষের মতই রাজনীতিতে, কূটনীতিতে, রাজ্যপরিচালনায় সে সমান দক্ষ। রণে, বনে, সংসার রঙ্গমঞ্চে পুরুষের পাশেপাশেই আছে সমান দীপ্তিতে।

নারীর এ অধিকার জন্মগত। তাকে আলাদা করে দেখার কোনো কারণ নেই। অধিকার কেউ কাউকে দেয় না। অধিকার পাইয়ে দেওয়া যায় না। কিংবা একপক্ষের দয়া, অনুগ্রহের ওপরও নির্ভর করে না। আবার ভিক্ষা করেও পাওয়ার জিনিস নয়। অধিকার নিয়েই মানবশিশু জন্মায়। অধিকার মানে আধিপত্য নয়, অধিকার হল আত্মমর্যাদাবোধ। নিজের প্রাপ্যকে সম্মানের সঙ্গে অর্জন করা। এই বিশ্বাস নিয়ে পুরাণের নারী চরিত্রগুলিকে হৃদয় খুঁড়ে বার করেছি। অধিকার যেহেতু জন্মগত, তাই আমার নারী চরিত্রগুলি নিজেরাই তাদের স্বক্ষেত্র চিনে নিয়েছে। পুরুষের হাত ধরে সে আসেনি, নিজের অধিকারে সমমর্যাদার দাবি নিয়ে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। তবু বাধার সমুদ্র পেরিয়ে তাকে কূলে পৌঁছতে হয়। পুরাণের নারী চরিত্রগুলি নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করে সেই বাধার জঞ্জাল সরিয়ে দিয়ে নিজেকে মুক্ত করেছে। সেই মুক্তদৃপ্ত নারীসত্তার কাছে পুরুষ অসংকোচে নিজেকে নিবেদন করেছে।

আমি বিশ্বাস করি, একজন নারী মনে প্রাণে চাইলে ব্যক্তিত্বের জোরেই নিজেকে মুক্ত এবং স্বাধীন বলে দাবি করতে পারে। সে নারী শ্রদ্ধার পাত্রী। সে নারী সবার বরণীয়! 'রানী কাহিনী'তে তেমন পাঁচজন নারীবাদী মহিলা নারী-স্বাধীনতার এক নতুন সনদ নিয়ে একবিংশ শতাব্দীর দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে ভৈরব হুঙ্কারে একালের নারীদের আহ্বান করছে। এক পা তার অতীতে আর এক পা বর্তমানে।

জন্মাষ্টমী ১৪০৯ — ড. দীপক চন্দ্র

৭, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র এভিনিউ
কলকাতা ৭০০ ০৩০
৫৪৮-৪৪৭৪

জননী কৈকেয়ী

নেপথ্যের
সহযোগিণী
ইলা চন্দ্র'কে

দৃষ্টিকোণ

রামায়ণে সবচেয়ে অবহেলিত এবং ঘৃণিত চরিত্র কৈকেয়ী। তাকে না হলে রামায়ণ হতো না। রামায়ণ রাম রাবণের যুদ্ধ কাব্য। কিন্তু এহ বাহ্য। ভ্রাতৃবিরোধের পরিণামকে ভ্রাতৃপ্রেমে উত্তরণের অবলম্বন হিসাবে রাবণের সঙ্গে রামের যুদ্ধ কাহিনীর প্রাধান্য সৃষ্টি করা হয়েছে। রাবণের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য রামচন্দ্র বনে গেল; এই স্থূল যুক্তিতেও বিশ্বাসী নই। অযোধ্যার আভ্যন্তরীণ প্রতিকূল রাজনীতি রামচন্দ্রকে আত্মরক্ষার জন্য বনে যেতে বাধ্য করেছিল। এই সত্য ঢাকতে পিতৃসত্যের অবতারণা। কৈকেয়ী রামচন্দ্রের বিমাতা, দশরথের অনার্যা পত্নী বলে তাকেই নিমিত্তের ভাগী করা খুব সহজ হলো। রাম-রাবণের যুদ্ধকাব্য রামায়ণ রচনায় কৈকেয়ীর ইন্ধন। তার নিষ্কলুষ মাতৃত্বকে কলঙ্কিত করা হলো। হাজার হাজার বছর ধরে কৈকেয়ী সেই কলঙ্কের ভারে ন্যুব্জ।

হঠাৎ আধুনিক লেখকের মনে প্রশ্ন জাগল, যে জননীর বক্ষদেশে মাতৃত্বের অমৃতকুম্ভ, সেই নির্মল মাতৃবক্ষ থেকে হঠাৎ হলাহল উঠল কেন? সেবা, করুণা, আত্মত্যাগের প্রতিমূর্তি কৈকেয়ীর সন্তানে আত্মপর নেই। তাহলে তার মাতৃত্বের পরিণাম এত করুণ, হৃদয়হীন হল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর রামায়ণে চাপা পড়ে আছে।

এই উপন্যাস কৈকেয়ীর জননীরূপকে খুঁজবার জন্য এবং বুঝবার জন্য। অযোধ্যার আকাশছোঁয়া প্রাসাদচূড়ার অভ্যন্তরে অযোধ্যার সিংহাসন নিয়ে যে পারিবারিক কলহ এবং ষড়যন্ত্র চলছিল তার অন্তঃস্রোতে ইক্ষ্বাকুবংশের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছিল। ভেতরে ভেতরে কেমন করে তা জীর্ণ করছিল ইক্ষ্বাকু রাজবংশকে তার এক মর্মন্তুদ কাহিনী উদঘাটন করে বোঝাতে চেয়েছি কৈকেয়ী নির্দোষ। আসলে, তার শুভ্র নির্মল মাতৃত্ব হল রাজনীতির শিকার। কৈকেয়ীর প্রবল মাতৃত্বের অভিমান তার দুর্ভাগ্যের কারণ। দশরথের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কৈকেয়ী সহধর্মিণীর কর্তব্য করেছে। ভরতের সিংহাসন চাওয়া কোন স্বার্থপরতা নয়। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে কৈকেয়ীর কোন কাজই পাপ নয়। পরিশেষে, আপন কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত দুঃখিত, ব্যথিত কৈকেয়ী যখন কুলের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য রামকে ফিরিয়ে আনতে ভরতের সঙ্গে বনগমন করল তখন কৈকেয়ীকে কোন বিচারে বলব, সে সর্ব কর্মনাশা, সে পাপী, ডাইনী, রাক্ষুসী?

রামায়ণে কৈকেয়ী কখনো দ্বিতীয়া মহিষী কখনো কনিষ্ঠা মহিষী বলে উল্লিখিত হয়েছে। কনিষ্ঠা মহিষী রূপে তাকে গ্রহণ করা আমার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, তাকে বিবাহ করার পর দশরথ সন্তানের পিতা হয়েছে। ঋষ্যশৃঙ্গের চরু ভক্ষণের ঘটনা একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। দশরথের লিঙ্গদৌর্বল্য এবং প্রজননশক্তি

পুনরুদ্ধারের সাফল্যে দশরথ যদি জনক হয় তাহলে সুমিত্রাকে অবশ্যই কৈকেয়ীর অগ্রে স্থান দিতে হয়।

ভরতকে দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে খাড়া করেনি, তবে তার ধারণা সৃষ্টি করেছি। কারণ ভরত সম্পর্কে দশরথের মনে একটা অহেতু ভীতি ছিল। দশরথের মনে ভরত সম্পর্কে ভীতিকেই আমি ভরতের জ্যেষ্ঠত্বের কারণ হিসেবে ধরেছি।

ভরত শত্রুঘ্ন আমার চোখে কৈকেয়ীয় যমজ পুত্র ছাড়া কিছু নয়। বাল্য থেকেই ভরত শত্রুঘ্ন কেকেয়রাজ্যে অবস্থান করছে। বিবাহের সময় ভরত শত্রুঘ্নকে আনার জন্য মিথিলা থেকে কেকয়ে দূত গিয়েছিল। কৈকেয়ী দশরথের কাছে অন্য রানীর দুই পুত্রের নির্বাসন চেয়েছিল। কিন্তু শত্রুঘ্নের কোন উল্লেখ নেই। এহ বাহ্য। শত্রুঘ্ন এবং লক্ষ্মণের মধ্যে যমজের ভ্রাতৃত্ববোধের এবং একাত্মবোধের কোন লক্ষ্মণ প্রকাশ পায়নি। এক বীজ থেকে যে দুটি প্রাণের জন্ম, তাদের আকর্ষণের একাত্মতায় যে যমজসুলভ ভাব থাকা উচিত তা লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের মধ্যে কোথাও দেখি না। বরং ভরত শত্রুঘ্নের মধ্যে পাই।

পরিশেষে বলব, রামায়ণ পাঠ রসাস্বাদনের আনন্দের দিকে নজর রেখেই বইটিকে সবদিক দিয়ে আধুনিক কালের উপযোগী করতে চেষ্টা করেছি। আমার প্রচেষ্টা কতখানি সার্থক হয়েছে বিদগ্ধ পাঠক-পাঠিকারাই তা বিচার করবেন। কৈকেয়ীর উপেক্ষিত অবহেলিত মাতৃত্বকে যদি সত্যই শ্রদ্ধার আসনে বসাতে পেরে থাকি তবে আমার শ্রম সফল হয়েছে বুঝব। এ সম্পর্কে কারো কোনো অভিমত থাকলে অবশ্যই লেখককে জানাতে পারেন।

২৫শে ডিসেম্বর ১৯৮৩ ডঃ দীপক চন্দ্র
৭ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এভিনিউ
পূর্বসিঁথি, দমদম জংশন
কলকাতা ৭০০০৩০
ফোন ২৫৪৮-৪৪৭৪

ঝিলাম নদীর তীরে সুন্দর মনোরম নগরী গির্জাক। কেকয় রাজ্যের রাজধানী। দুর্ধর্ষ উপজাতি অধ্যুষিত কেকয় রাজ্যের নৃপতি হলেন অনুবংশের অশ্বপতি। অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি। অতিথিবৎসল বলে খ্যাতি আছে তাঁর। অতিথিকে ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করেন। অতিথি শত্রু হলেও সমাদরের কোন কার্পণ্য নেই তাঁর।

অকস্মাৎ অযোধ্যার রাষ্ট্রদূতের আগমন উপলক্ষ করে কেকয়ের নানা লোক নানরকম কথা বলতে লাগল। রাজকর্মচারীদের মধ্যেও জল্পনা কল্পনার অন্ত নেই। যে যার নিজের দিক থেকে ব্যাখ্যা করল। অনেক যুক্তি তর্কের অবতারণা হল রাজসভায়। প্রত্যেকের বক্তব্যে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। তবু মীমাংসায় পৌঁছানো গেল না। মতান্তর বাদ প্রতিবাদের উত্তেজনা জমে উঠল রাজধানীর মজলিসে মজলিসে। অবশেষে গণ্যমাণ্য ব্যক্তিদের নিয়ে রাজসভা বসল।

কাঞ্চন নির্মিত বেদীতে স্থাপিত স্বর্ণ সিংহাসনে মহারাজ অশ্বপতি উপবিষ্ট। তাঁকে গম্ভীর এবং চিন্তিত দেখাচ্ছিল। গালে হাত রেখে গভীর মনোযোগের সঙ্গে সকলকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। পাত্র মিত্র সভাসদও নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট ছিল। অমাত্য প্রধান সুবীর উঠে দাঁড়িয়ে রাজসভার মধ্যে বলল : মহারাজ, অনুমতি করলে নগরবাসীরা যা বলছে, আমি নিবেদন করতে পারি। বেশির ভাগ নাগরিকের মত হল যে, দণ্ডক প্রদেশের বৈজয়ন্ত নগরের অধীপতি শম্বর মহারাজের বন্ধু। আমাদের মিত্র রাজা। তিনি এখন দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধরত। তাঁকে আক্রমণের উদ্দেশ্যেই অযোধ্যাপতি চতুরঙ্গ বাহিনী সাজিয়ে আসছেন। ব্রক্ষাবর্তের পথে রাজা দশরথ আমাদের রাজ্যে আতিথ্য গ্রহণ করলে কার্যত শম্বরের মনে আমাদের সম্পর্কে একটা সন্দেহ সৃষ্টি হবে। এই ভ্রম সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কেকয়ের মাটিতে পা রাখছে। এ সময় তাঁকে রাজনৈতিক আতিথ্য জ্ঞাপন করলে বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। দশরথের আতিথ্যগ্রহণের মতলব বন্ধুজনোচিত নয়।

প্রধান পুরোহিত বলল মহারাজের অনুমতি পেলে আমি দু'চার কথা সংযোজন করতে পারি। অশ্বপতি মাথা নেড়ে তাকে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। রাজাদেশ লাভ করে পুরোহিত বলল : দশরথ একজন চতুর ধুরন্ধর রাজনৈতিক নেতা। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সব কিছু বিচার বিবেচনা করে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। অতএব এ আগমন কিছুতে তাঁর সদিচ্ছা সফর নয়, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। আমাদেরও রাজনৈতিক ভাবে নিতে হবে। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের স্বরূপ নিয়ে যত মতভেদ।

যুবরাজ ভদ্র অধৈর্য হয়ে বলল : মতভেদ থাকবে কেন? আমরা অনুবংশের লোক। শম্বর আমাদের বন্ধু ও স্ববংশীয়। রাক্ষসদের মতো অসুরদের একটি পৃথক দুনিয়া প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প নিয়ে শম্বর রাবণের বন্ধু ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে। দেবলোককে সে অসুরলোক করবে। এতে অন্যায় কোথায়? রাবণের সঙ্গে আমাদের বিরোধ থাকলেও বিদ্বেষ নেই। তাই দেব-বিরোধী গোষ্ঠী নিয়ে রাবণের ঐক্য ভাঙারও কোন প্রশ্ন ওঠে না। দেবতারা আমাদের শত্রু। উপজাতি বংশোদ্ভূত অনুবংশীয় বীরদের ম্লেচ্ছ বলে ঘৃণা করে তারা। বিদ্রূপ করে। অবহেলা দেখায়। তাই তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোকে আমরা জাতীয় কর্তব্য মনে করি। পিতা হলেন শম্বরের পুরোনো বান্ধব। দেবতাদের সঙ্গে সংঘর্ষে পিতা শম্বরের পক্ষে। এঁরা দুইজন একত্রে যুদ্ধ করলে দেবলোকের সাধ্য নেই তাদের প্রতিরোধ করে। এমনিতে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে তারা সর্বস্বান্ত হয়েছে। এরকম একটি সুন্দর সুযোগে শম্বরের দেবলোক আক্রমণ আমরা সমর্থন করি! কিন্তু দশরথ আসছেন আমাদের বিভেদ

বাড়াতে। সুতরাং, তাঁকে কেকয়রাজ্যের অতিথিরূপে বরণ করা কতখানি সঙ্গত পিতাকে তা ভেবে দেখতে হবে।

সেনাপতি অশ্বসেন বলল : অযোধ্যাপতি দশরথ কখনই অতিথির যোগ্য নন। কেকয় রাজ্যের ভেতর দিয়ে তাঁর চতুরঙ্গ বাহিনীর যাত্রা কিছুতে অনুমোদন করা যায় না। এতে দেশের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হয়। প্রকৃতপক্ষে, এই সমরাভিযান তাঁর সামরিক বাহিনীর মহড়া। বিপক্ষদলের মনে অকারণ একটা উৎকণ্ঠা ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে তাদের মনোবল নষ্ট করা এবং এক দুঃসহ স্নায়ু উত্তেজনায় সর্বক্ষণ ব্যস্ত ও ত্রস্ত রেখে তাদের আত্মবল ধ্বংস করে, তাদের সামরিক প্রতিক্রিয়া ও মতিগতি নির্ণয় করার এক চমৎকার দাওয়াই এই সামরিক মহড়া। শত্রুকে হুঁশিয়ার করা এবং তার আচরণকে যথেষ্ট সংযত ও শান্ত রাখার এক পরোক্ষ চাপ। চতুর অযোধ্যাপতি ঠাণ্ডা মাথায় স্নায়ু যুদ্ধের এক উত্তপ্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করে শম্বরের প্রতি আমাদের কর্তব্য ও বন্ধুত্ব জাগ্রত করে এক বৃহৎ রাজনৈতিক জয় আদায়ের ফন্দী এঁটেছেন। শম্বরের সঙ্গে আমাদের বিভেদ সৃষ্টি তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর জয়ে আমাদের পরাজয়। এ কথা মনে রেখে আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে।

মন্ত্রীবর সুবীর ধীরে ধীরে শান্ত গলায় বলল : সেনাপতি অশ্বসেনের বক্তব্য আমি সমর্থন করি। আমার অভিজ্ঞতা বলছে, শম্বরকে যুদ্ধে নিবৃত্ত করার কৌশলরূপে ধূর্তরাজা সরল, মহাপ্রাণ, অতিথিবৎসল কেকয় রাজকে ব্যবহার করবে। অথবা, কেকয় রাজ্যের দুর্বলতার রন্ধ্রপথগুলি অনুসন্ধান করে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক দাবি আদায়ের চাপ সৃষ্টি করবে।

তারপর কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে মন্ত্রীবর সুবীর পুনরায় বলল : আমার আরো ধারণা, অতান্ত সজ্জন, অতিথিবৎসল কেকয়রাজকে আতিথেয়তায় ব্যস্ত রেখে শম্বরকে নির্বান্ধব করাও তাঁর উদ্দেশ্য হতে পারে। শুধু তাই নয়, অযোধ্যার বিশাল সৈন্যবাহিনীর আহারাদি এবং অন্যান্য সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করতে কেকয়ের শস্যভাণ্ডার এবং অর্থ ভাণ্ডারে যথেষ্ট টান পড়বে। এর ফলে কেকয় রাজ্যে বেশ একটা অর্থনৈতিক অসুবিধা সৃষ্টি হবে। বিপুল ক্ষয় ক্ষতির অঙ্কে কেকয় রাজ্যে এমন এক দুর্বিষহ অবস্থার উদ্ভব হবে যা তার নিজের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলবে। অতএব অযোধ্যাপতির প্রবেশ নিরর্থক এবং ক্ষতিকর।

কেকয়রাজ অশ্বপতি কিন্তু এত সব কথার মধ্যে একটি কথাও বললেন না। মনোযোগ সহকারে সকলের কথা শুনছিলেন। প্রত্যেকের বক্তব্যে যথেষ্ট যুক্তি এবং চিন্তা ছিল। নিজেকে যথাসম্ভব তাদের আলোচনা থেকে দূরে রেখে নিরাবেগ চিত্তে তাদের শণিত কথাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করছিলেন। অকস্মাৎ একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল তাঁর। আস্তে আস্তে নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন : মহামতি দশরথের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় আমাদের অপরিজ্ঞাত। তবু তাঁকে নিয়ে যে আলোচনা হল তাতে প্রত্যেকের দেশপ্রেম, স্বজাতিপ্রীতি, বন্ধুত্বের মর্যাদারক্ষায় আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। আপনাদের প্রত্যেকের কথা শুনে আমি ভীষণ আনন্দিত এবং গর্বিত। আপনাদের মত আমি এদেশের গৌরব ও মর্যাদা রক্ষায় সচেতন। আপনাদের সকলের বক্তব্য যত যুক্তিপূর্ণ হোক না কেন, অনুমানের উপর নির্ভর করে শুধু সন্দেহের বশে তাঁর আতিথ্যের আবেদনকে যথাযোগ্য মর্যাদা না দেয়ার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। আপনাদের পুনর্বিবেচনাব জন্যই আমি কতকগুলি কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করছি। অকারণ শত্রু সৃষ্টি করা রাজনীতির ধর্ম নয়। মিত্র আচরণে পরিতুষ্ট রেখে হৃদয় জয় করা শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকের কূটকৌশল। তাই বলছি, মাননীয় অতিথিকে অকারণ সন্দেহের চোখে দেখে যদি ভুল করি তা-হলে শত্রুর হাতই শক্ত হবে তাতে। সমাদরে যাকে ধন্য করতে পারি, অনাদর করে তাকে শত্রু করব কেন? তাঁর বিশাল সমরবাহিনী সম্পর্কে সেনাপতি অশ্বসেনের আশঙ্কার কোন ভিত্তি নেই। রাজ্যের ভেতর দিয়ে সেনাবাহিনী গেলেই যে রাজ্য জয় হয়ে গেল, আমি বিশ্বাস করি না। আমাদের সতর্ক সেনাবাহিনী সর্বদা মিত্রবাহিনীকে বেষ্টন করে আছে। রাজ্য সীমার বাইরে বেরোনোর পথ বন্ধ। বাইরের পথ খোলা না থাকলে অবরুদ্ধ হয়ে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করা যায় না। রসদ এবং যুদ্ধাস্ত্রের নিয়মিত সরবরাহের পথ বন্ধ রেখে কোন মূর্খও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। এই সরল সত্য কথাটা মনে রাখলে আর আশঙ্কা থাকবে না। অতএব, আপনাদের সম্মতি পেলে মহামান্য অতিথি বরণের আয়োজন করতে পারি।

অশ্বপতির পরামর্শ অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হল সভায়। সবাই একবাক্যে তাঁর বক্তব্য অনুমোদন করল।

অতিথিবরণের সাজসাজ রব পড়ে গেল রাজধানী গির্জাকে। সমগ্র নগরী উৎসবের রূপ পেল। পত্র পুষ্পে পল্লবে পতাকায় সজ্জিত করা হল বিশাল রাজপথ। প্রতিটি পথের সংযোগস্থলে তোরণ নির্মিত হল। রাজপ্রাসাদও রূপে রঙে রেখায় অপরূপ হয়ে উঠল। স্বয়ং কেকয়রাজ অযোধ্যাপতি দশরথকে সমাদর করে প্রাসাদে নিয়ে গেলেন।

দশরথ বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ অযোধ্যার বিখ্যাত মূল্যবান শিল্পদ্রব্য, উপহার সামগ্রী এবং বহু সুন্দরী রমণী কেকয়রাজকে দিয়ে প্রীত করল।

দণ্ডক প্রদেশের বৈজয়ন্ত নগরের অধিপতি শম্বর চতুরঙ্গ বাহিনী সজ্জিত করে ব্রহ্মলোক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। লক্ষ্য তার ইন্দ্রলোক জয়। রাবণের সঙ্গে ইন্দ্রের সখ্য সম্পর্ক তার মনঃপুত হয়নি। রাবণের একাধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব তাকে ঈর্ষান্বিত করল। ক্ষমতা ও প্রভুত্ব নিয়ে রাক্ষস ও অসুরের বিরোধ পুরনো। সেই বিরোধের ইন্ধন দিয়ে সে এক বিভেদের রাজনীতি সূচনা করল। অসুরদের একত্র করে সে এক পৃথক অসুরভূমি গঠনের সংকল্প প্রকাশ করল। কিন্তু তার সংগ্রাম রাবণের সঙ্গে নয়, দেবতাদের বিরুদ্ধে।

শম্বরের সঙ্কল্প সব অসুর অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রচার করা হল। কিন্তু অনেকে রাবণের ভয়ে এবং ঐক্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় শম্বরের আহ্বানে সাড়া দিল না। তখন তাদের উপর প্রচণ্ড চাপ এবং ভীতি প্রদর্শন করা হল। সব অসুর প্রধানের কাছে তার আদেশ নির্দেশ নতুন নতুন করে জারি হল। ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতা ও দেবলোক নিশ্চিহ্ন করে ভারতবর্ষের মানচিত্র থেকে ব্রহ্মাবর্ত নামক স্থানটিকে সে মুছে ফেলবে। অধিকৃত দেবভূমি অসুরভূমি নামে অভিহিত হবে। শুধু অসুরেরা থাকবে সে রাজ্যে। শম্বরের অভিনব ঘোষণায় প্রতিটি বীর অসুরের রক্ত যুদ্ধের জন্য নেচে উঠল। যুধাস্ত্র ভর্তি শকট সাজিয়ে তারা শম্বরের সঙ্গে ব্রহ্মাবর্তে যাত্রা করল। প্রতিটি যোদ্ধার মুখে দেবলোকের প্রতি সুতীব্র ঘৃণার অভিব্যক্তি। চোখে তাদের অনাগত এক অসুর রাজ্যের স্বপ্ন।

দেবলোক থেকে সে খবর পৌঁছল আর্যাবর্তে। ইন্দ্র সবার কাছে আবেদন জানাল। সকলের সাহায্য প্রার্থনা করল। কিন্তু দুর্দিনে তার পাশে দাঁড়ানোর জন্য কোন আর্যনৃপতি এগিয়ে গেল না। রাবণের রক্তচক্ষুকে ভয় পেল তারা। আর্যাবর্তের প্রধান নরনাথ অযোধ্যা মহীপতি দশরথকে প্রতিনিধি করে তারা ইন্দ্রলোকে পাঠাল। সব আর্যরাজই গোপনে নিজ নিজ বাহিনী থেকে বেশ কিছু সৈন্য, অস্ত্র, অশ্ব, শকট, খাদ্য, রথ প্রভৃতি দিল। বিশাল সৈন্যবাহিনীর মধ্যভাগে দশরথ মধ্যাহ্নসূর্যের মতো শোভা পাচ্ছিল।

যাত্রার সময় দশরথ নানা রকম দামী নয়ন মনোহর উপহার সামগ্রী নিয়েছিল। গোড়াতেই সে মতলব করেছিল কেকয়রাজ্যের অধিপতি অশ্বপতিকে বশ করতে পারলে দেবাসুরের সংগ্রামের চিত্র বদলে যাবে। কারণ অশ্বপতি এবং শম্বর দুই বন্ধু। তাদের প্রণয়ও গাঢ়। শম্বরের দক্ষিণ হস্তও বটে। অশ্বপতির সৈন্যবাহিনী বিশাল। প্রত্যেকেই রণকুশলী এবং কষ্টসহিষ্ণু। জীবন মরণ পণ করে এরা যুদ্ধ করে। সুতরাং, দেবতাদের সঙ্গে রণে তাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারলে অনেকখানি জয় আদায় করা সম্ভব হবে। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করবে কোন্ মন্ত্রবলে? তবু দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করার একটা উপায় সে চিন্তা করতে লাগল। অবশেষে চরের মুখে জানতে পারল, অশ্বপতি ভীষণ অতিথিবৎসল রাজা। অতিথি তাঁর কাছে সাক্ষাৎ নারায়ণ। অতিথি শত্রু হলেও অশ্বপতি সমাদরের কোন ত্রুটি রাখেন না। এই চরিত্রগুণটিকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির হাতিয়ার করে দশরথ তাঁর কাছে রাষ্ট্রদূত পাঠাল। এবং ম্লেচ্ছরাজ্য কেকয়ের ভেতর দিয়েই সে ব্রহ্মালোকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। অশ্বপতির আতিথ্য গ্রহণ করে তাকে কিছুটা বন্ধুভাবাপন্ন করা সম্ভব বলে মনে হল।

দশরথের সম্মানে কয়েকদিন ধরে উৎসব চলল কেকয়ে। খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান এর আনন্দ

উৎসবে রাজপ্রাসাদ মেতে রইল। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা দশরথকে দেখার জন্য রাজ্যের গণ্যমান্য বহু ব্যক্তির সমাগম হল সেখানে। এছাড়াও প্রতিদিন বহু দর্শনার্থীর ভিড় লেগেই ছিল। দশরথের শিষ্ট আচরণে, সুমিষ্ট ভাষণে সকলে তুষ্ট হল। ম্লেচ্ছরাজ্যের অধিপতি থেকে আরম্ভ করে সম্ভ্রান্ত সকল ব্যক্তি তাঁর সংস্পর্শে নিজেকে ধন্য মনে করল।

অতিথির আদর, যত্ন পরিচর্যার একটুও ত্রুটি রাখলেন না অশ্বপতি। সেবায় স্বাচ্ছন্দ্যে আতিথেয়তায় অন্তরঙ্গতায় দশরথ অভিভূত হল।

অবশেষে যাত্রার দিন উপস্থিত হল। যাত্রার আগে দশরথ শিবমন্দিরে গেল পূজা দিতে। কেকয়রাজ অশ্বপতিও তার সঙ্গে রইলেন। সুসজ্জিত সপ্ত অশ্ববাহিত রথে তাঁরা দু'জন মন্দিরে গেলেন।

মন্দিরে অতিথি আপ্যায়নের দায়িত্ব ছিল কেকয় রাজকন্যা কৈকেয়ীর উপর। পূজারী পুরোহিত পূজাবিধি পালনে দশরথকে যত সাহায্য করুক আর আপ্যায়ন করুক, পরিচর্যা রমণীয় হয় রমণীর সেবা ও সান্নিধ্যে। অতিথি সেবা ত্রুটিহীন করতে আতিথেয়তাকে আরো অন্তরঙ্গ ও মধুর করতে কেকয়রাজ আপন দুহিতাকে মন্দিরে নিযুক্ত করলেন।

মন্দিরের পথ পুষ্পমাল্যে এবং নানাবর্ণের পতাকায় সজ্জিত করা হল। দু'একটি তোরণও রাজপথে নির্মিত হল। উঁচু চড়াই পাহাড়ী পথের দুধারে উৎসুক মানুষের ভিড়। জনতার অভিনন্দন এবং হর্ষ কুড়োতে কুড়োতে দশরথের রথ ভিড়ের ভিতর দিয়ে মন্দগতিতে এগিয়ে চলল।

রথ মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে বিবিধ বাদ্যযন্ত্র একসঙ্গে বেজে উঠল। পুরনারীরা উলু ও শঙ্খধ্বনি দিল। যুবরাজ ভদ্র এবং মন্ত্রীবর সুবীর দুজনে দশরথকে সাদরে অভ্যর্থনা করল। জনতা জয়ধ্বনি দিল। সকলের সঙ্গে দশরথ মন্দিরে প্রবেশ করল। অমনি সুগন্ধী পুষ্প বলয়ে সজ্জিতা একদল নৃত্য পটীয়সী যৌবনবতী দেবদাসী মরালীর মতো ভেসে ভেসে এল নাটমঞ্চে। প্রস্ফুটিত ফুলের মতো সজীব এই সুযৌবনা দেবদাসীরা তাদের যৌবনপুষ্ট দেহের লীলায়িত বিন্যাসে বিচিত্রমুদ্রা রচনা করে নাচতে লাগল। নাচছিল পাগলের মতো। সমুদ্রে ঢেউয়ের মতো দুলছিল তাদের দেহ। বিদ্যুতে রেখার মতো তাদের আঁখিকোণে কটাক্ষ মুহুর্মুহু ঝলক দিচ্ছিল। রঙিন কাঁচুলির আড়ালে দুটি বক্ষ গোলক উত্তেজনায় অধৈর্য হয়ে ঘন ঘন কাঁপছিল। ললনারা চক্রকারে পাক দিতে দিতে উল্কার মতো ছুটে গেল দেব বিগ্রহের দিকে। নাটমঞ্চ থেকে দেখা যাচ্ছিল কাঞ্চনময় মঞ্চে রক্ষিত হর পার্বতীর অনুপম যুগল শিলামূর্তি। নর্তকীরা সকলে একসঙ্গে হরপার্বতীর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। শ্বেতপাথরের বেদীর উপর মাথা রেখে তারা আকুল হয়ে নিজেকে নিবেদন করল।

দশরথের দুই চোখে মুগ্ধ তন্ময়তা। অভিভূত আচ্ছন্নতার ভেতর তলিয়ে গিয়ে যন্ত্রচালিতের মতো অশ্বপতি, ভদ্র প্রমুখদের অনুসরণ করল। আলো ঝলমল মন্দির দ্বারের সম্মুখে এসে দাঁড়াল তারা।

দশরথের চোখের তারায় তখনও অনাস্বাদিতপূর্ব সুখানুভূতির আবেশ। মৃদুগতি মরালীর মতো সামনে এসে দাঁড়াল কেকয় রাজকন্যা কৈকেয়ী। কৈকেয়ী গৌরবর্ণা। প্রতিমার মতো বিখুঁত মুখ। ছোট কপাল তার চমৎকার। থোকায় থোকায় নেমে আসা চুল কোমর পর্যন্ত। পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়া ঝর্নার মতো অবিন্যস্ত তার কেশদাম। মসৃণ ত্বক, চোখা নাক, খাসা চোখ। নীলকান্ত মণির মতো চোখের তারা দুটি। পল্লবঘন চোখ দুটি সরোবরের মতো স্থির, শান্ত। অগাধ ও গভীর। কি গভীর অনুভূতি মাখানো চাহনি। ঘুম ঘুম আবেশে বিভোর। বর্তুলকার চিবুক, বিম্বফল সদৃশ ঠোঁট, মুক্তার মতো ঝকঝকে দাঁত, ঝিনুকের মতো কান, মরালের মতো গ্রীবা, শঙ্খের মতো পয়োধর। যাকিছু রমণীয় এবং সুন্দর ঈশ্বর যেন উজাড় করে দিয়ে অনুপমা করে গড়েছেন তাকে।

দশরথ স্তব্ধ। চোখের পলক পড়ে না তার। চোখ দুটো খাদ্যোতের মতো জ্বলে। কৈকেয়ীর উদগ্র যৌবন যেন মরীচিকার মতো জ্বল জ্বল করে জ্বলছিল। তৃষ্ণার্ত পথিকের মতো আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে লুব্ধ দৃষ্টিতে দশরথ তার দিকে চেয়েছিল।

কৈকেয়ীর বর্ণাঢ্য পোশাক আর ঝকমকে অলঙ্কার শোভিত তনু বহুমূল্যের রত্নখচিত হাল্কা নীল শাড়ির সঙ্গে মানিয়ে গেছে চমৎকার। নীবিবন্ধ থেকে পা পর্যন্ত কাপড়ের কুঁচি উরুর দুইদিকে সমান

ভাবে পাটে পাটে থাকে থাকে নিচ পর্যন্ত নেমে গেছে। কোমরের উর্ধ্বভাগে চুমকির কাঁচুলি ছাড়া আর কোন আবরণ নেই। বিমুগ্ধ পুরুষের দৃষ্টি থেকে কমনীয় উর্ধ্বাঙ্গকে ঢেকে রাখার কোন সামাজিক অনুশাসন উপজাতি সমাজে নেই। রাজকন্যা হলেও উপজাতি সমাজের রীতি তাকেও মানতে হয়। অলঙ্কার প্রিয় উপজাতি রমণীর মতো কৈকেয়ীও তার তন্বী সুঠাম অবয়ব সাজিয়ে তুলেছে বিবিধ স্বর্ণালঙ্কারে। ঝিনুকের মতো দুটি কানে মুক্তোর ঝুমকো, চন্দ্রশোভার মতো ললাটে টায়রা, বল্লরীর মতো ভুজদ্বয়ে কঙ্কন, বলয়, পদ্মনালের মতো কণ্ঠে হারের লহর। মেঘবরন কুন্তলে থোকা থোকা সুগন্ধী পুষ্পগুচ্ছর সঙ্গে সোনার কাঁটা আর চিরুনী। সব অলঙ্কারে সোনার উপর জড়োয়া কাজ। চুনির পাশে পান্না, পীতাভ পোখরাজ আর হীরে, মোতি জহরৎ মিশে রঙের ইন্দ্রধনু সৃষ্টি করেছে। ফুল্লপয়োধরের পীতবর্ণ রেশমীর কাঁচুলিতে মরকতের গায়ে সোনা আর পদ্মরাগ মণি জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। রূপ নয় রূপের আগুন। সে আগুনে পুরুষের মন পোড়ে, দেহ জ্বলে।

দশরথের আকস্মিক ভাবান্তর চতুর অশ্বপতির দৃষ্টি এড়াল না। অধরে তাঁর গর্বিত হাসি ফুটল। চোরা চোখে তাকাতে গিয়ে দশরথের সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হয়ে গেল। বিব্রত লজ্জায় সংকুচিত হল দশরথ। নিজেকে সংযত করার জন্যে দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল। বিভ্রান্ত চাহনিতে কামনার আগুন নিভে গিয়ে ফুটে উঠল অকপট বিস্ময়।

অশ্বপতি কৈকেয়ীর অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের দিকে ইঙ্গিত করে গর্বিত কণ্ঠে মৃদুস্বরে উচ্চারণ করলেন : আমার কন্যা কৈকেয়ী।

অশ্বপতির ইংগিত স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল।

একথা শুনে লাজুক অপ্রতিভতায় দশরথের ভুরু কোঁচকাল। মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল। শরবিদ্ধ হরিণের মতো আর্তস্বর তার কণ্ঠ থেকে তৎক্ষণাৎ নির্গত হল : অঃ!

কৈকেয়ীর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। কৌতূহলহীন নির্বিকারত্ব তার ভরা যৌবনের ব্যাক্তিত্বকে বিশিষ্ট করে তুলল। রূপের দেমাকেই সে যেন একটু বেশি স্বতন্ত্র। তবু দশরথের মনে হল, সত্যিই অসাধারণ সে। তার সঙ্গে দুটো কথা বলতে ইচ্ছে হল। কিন্তু একটা ভীষণ দুর্বলতায় তার বুক কাঁপছিল। লজ্জা পাচ্ছিল। শুধু অবাক হয়ে চেয়ে রইল। কেমন বেদনাচ্ছন্ন আর সকরুণ সে দৃষ্টি।

মৃদু হাসির আভাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কৈকেয়ীর সুডৌল মুখখানা। মধুর কণ্ঠে বলল : মহারাজ পবিত্র গঙ্গাজলে আচমন করে হরপার্বতীর বিগ্রহ প্রদক্ষিণ করুন আমার সঙ্গে। তারপর গন্ধধূপ আর পুষ্প দিয়ে দেবতার অর্ঘের আয়োজন করুন।

দশরথ সহসা কথা বলতে পারল না। সম্মোহিতের মতো তার অনুগমন করল। মধুর প্রসন্নতায়, আবিষ্ট তার চেতনা। রাজেন্দ্রাণীর মতো কৈকেয়ীর শান্ত সমাহিত রূপের ঐশ্বর্য তাকে কৈকেয়ীর দিকে বেগে আকর্ষণ করতে লাগল। বাসনা অনন্ত কামনার দীপ হয়ে জ্বলছিল বুকে। বাসনা পুরণের উন্মাদনায় আকুল হল সে। কারণ, বীর চায় প্রতিমূহূর্তে নিজের জীবনকে সার্থক করে পেতে। জীবন তার কাছে খেলার, আনন্দের উপভোগের। জীবনকে বাজি রেখে বীর জীবন মরণ যুদ্ধে নির্দ্বিধায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে যেমন তার বুক কাঁপে না, তেমনি জীবনের সুখ, তৃপ্তি আনন্দের জন্য বীর্যের গর্বে সুন্দরী নারীকে দাবি করতেও কুণ্ঠা নেই তার। এ হল বীর-ধর্ম। এ দাবি সব বীর্যবান পুরুষের। পৃথিবীর সমস্ত ভোগ্য ধন বীর কামনা করে। একে ভাগ্যের প্রসাদ বা অনুগ্রহ মনে করে না। দাবিই মনে করে। রূপবতী কৈকেয়ী দশরথের হৃদয়ে সেই অনুচ্চারিত দাবির প্রতিধ্বনি করল।

বিগ্রহ প্রদক্ষিণ করতে করতে অপরাধীর মতো নিজের ত্রুটি স্বীকার করে সংযত স্বরে আত্মনিবেদনের ভাষায় বলল : রাজকন্যা আমি তো এদেশের ধর্ম কর্মের রীতি নীতি জানি না। তুমি আমার হাত ধরে শিখিয়ে নাও।

বিগ্রহের পিছনে ছাই ছাই অন্ধকার। তবু, দশরথ কৈকেয়ীর নিঃশব্দ হাসির ভেতর তার উদ্দাম প্রাণের ইশারা ফুটে উঠতে দেখল। অমনি বুকের ভেতর দুরু দুরু করে উঠল। আদিম কামনা প্রগলভ করে তুলল তাকে। ফিস্ ফিস্ স্বরে বলল : প্রেমের দেবতা হর পার্বতীর ভাষা শুনতে পাচ্ছ রাজকন্যা?

মন্দির অভ্যন্তরে নিথর স্তব্ধতার ভেতর তার কথাগুলো কাতর কান্নার মতো শোনাল।

দশরথের প্রশ্নে কৈকেয়ী থমকে দাঁড়াল। বিগ্রহের সুউচ্চ কাঞ্চন মঞ্চে কান পাতল। গোল মুখে, কাজল কালো চোখের তারায় হাসি হাসি সরলতা, কৌতুকে উজ্জ্বল। ফিস্ ফিস্ স্বরে বলল: প্রেমের দেবতা পাষাণ। তাঁর হৃদয় নেই। তবু মানুষের প্রাণের বীণায় তার মৌন স্তম্ভিত প্রেমের অব্যক্ত বাণী সুর হয়ে ওঠে। এ জন্যেই নিদ্রিত দেবতাকে বলে জাগ্রত।

বিচিত্র একটা পুলকানুভূতিতে দশরথের মনটা প্রজ্জ্বলিত মোমের মতো গলে গলে পড়তে লাগল। আকস্মাৎ শত কৌতূহলিত মানুষের দৃষ্টির সম্মুখবর্তী হওয়ার জন্য নিজের আবেগকে মুহূর্তের জন্য সংযত করল। তারপর, পুনরায় দৃষ্টি অন্তরালবর্তী হলে, নিচু গলায় বলল : রাজকন্যা, যুগ-যুগান্তর ধরে প্রেম মানুষের রক্তে বহমান। সরল ধর্মবিশ্বাসের আলোয় তাকে আরো উজ্জ্বল এবং শাশ্বত করে তুলতে এই পাষাণ বিগ্রহের আয়োজন। হরপার্বতীর ঐ যুগল রূপ অনাদিকাল ধরে ঈশ্বরের বাণী শোনাচ্ছে। বলছে : মানুষ তুমি পশু নও, অমৃতের সন্তান! তোমার ভেতরের পশুকে প্রেম সুন্দর করে। বিশ্ব চারাচরের মানুষের কল্যাণের প্রতীক প্রেমের এই যুগল বিগ্রহ। প্রেমের বীর্যে মানুষ সুন্দর হয়। মহান হয়।

কৈকেয়ী কথা বলতে পারল না। প্রস্তর-মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। বিস্মিত বিহ্বলতা নামল তার দুই চোখে। তার স্নায়ুতে তরঙ্গায়িত হয়ে প্রবাহিত হল তীব্র একটা আশঙ্কা আর উৎকণ্ঠা। তথাপি, বুকের ভেতর জলতরঙ্গের মতো রিন রিন করে বাজছিল দশরথের কথাগুলো। স্তিমিত আলোয় দেখল দশরথের অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা যৌবন সমুজ্জ্বল অনিন্দ্যসুন্দর দীর্ঘ দেহ এবং স্বাস্থ্য। তারুণ্যের সৌন্দর্য, দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য, কমনীয়তা অটুট তার শরীরে। প্রস্ফুটিত পুষ্প যেমন ভ্রমরকে আকর্ষণ করে তেমনি একটা আকর্ষণ তার অবয়বে, নম্র চাহনিতে; পনীরের মতো কোমল রক্তবর্ণ অধরে। নিদারুণ উত্তেজনায় কৈকেয়ীর দেহমন বিকল হয়ে গেল। আধোমুখে দাঁড়িয়ে রইল। দৃপ্ত যৌবনা রমণীর সেই অনির্বচনীয় লাজুক অপ্রতিভ সৌন্দর্যের দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দশরথ তাকিয়ে রইল। নিরীক্ষণ শুধু করল না, হৃদয়ঙ্গমও করল। কৈকেয়ীর দুই চক্ষু বোজা। বিপুল আত্মপ্রসাদে উদ্দীপ্ত হল দশরথ। নিঃশ্বাসের সীমানায় ঘনীভূত হয়ে উঠল তার কণ্ঠস্বর। বলল : স্তিমিত আলোতেই তোমাকে দেখতে আমার ভাল লাগছে রাজকন্যা। নিজেকে নিঃশেষে উজাড় করে দিতে এত আনন্দ হচ্ছে কেন? ভক্ত যেমন সর্বস্ব নিবেদন করে দেবতাকে, ঠিক তেমনি দীনাতিদীন প্রার্থীর মতো আমিও নিজেকে নিবেদন করলাম তোমার কাছে। প্রেমের দেবতার ইচ্ছায় তুমি আমার ধর্মের সহকর্মিণী হয়েছ। সহধর্মিণী হতে বাধা কোথায়? এখন তোমার ইচ্ছে হলে দুটি শীর্ণ তটিনী এক হয়ে মিশে যেতে পারে সাগরে।

কৈকেয়ী আর নিজেকে সংযত করতে পারল না। দক্ষিণ হস্তের করতল দিয়ে দশরথকে সজোরে ঠেলে দিয়ে বিগ্রহের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। দশরথ দেখল কৈকেয়ীর কোন চাঞ্চল্য নেই। সে নির্বিকার, নিরাবেগ চিত্তে তার হাতে পুষ্প বিল্বপত্র দিল। কণ্ঠ মিলিয়ে তার সঙ্গে পুরোহিতের উচ্চারিত মন্ত্র পাঠ করল।

অর্ঘ্যদানের অনুষ্ঠান শেষ হল একসময়। প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে রইল দশরথ। তার চেতনার ভেতর, সমস্ত সত্তার ভেতর কৈকেয়ীর অনির্বচনীয় শরীরী সৌন্দর্য নানাবিধ মিশ্র অনুভূতির প্রতিক্রিয়ায় প্রতিক্রিয়াশীল। তাই কেমন একটা নিশি পাওয়া মানুষের মতো আচ্ছন্ন অভিভূতভাব তার মুখে থমথম করতে লাগল। উপস্থিত রাজপ্রতিনিধিরা কিন্তু ভাবছিল, ভক্তবৎসল মহামান্য অতিথি তদ্গতচিত্তে দেবতার ধ্যান করছে। তাই, এরূপ আত্মসমাহিত তিনি।

অনেকক্ষণ কেটে গেলে কৈকেয়ী মধুর কণ্ঠে ডাকল তাকে। বলল : মহারাজ! কি মিষ্টি সেই স্বর! মনে হল অনেকদূর থেকে সে স্বর যেন ভেসে ভেসে এল দশরথের কানে।

দশরথের বুকের ভেতর চঞ্চল বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল। স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে তাকাল তার দিকে। উদভ্রান্ত চোখে অন্য সকলের দিকে তাকিয়ে প্রায় নিঃশব্দ গলায় বলল : চলুন তাহলে।

অশ্বপতির সঙ্গে রথে ওঠল দশরথ। রথে দশরথ সর্বক্ষণ অন্যমনস্ক উদাসীন ছিলেন। নিজের

মনের ভেতর ডুব দিয়ে কি যেন ভাবছিল তন্ময় হয়ে। তার এই আকস্মিক আশ্চর্য পরিবর্তন অশ্বপতিকে অবাক করল। নাটমঞ্চে রূপধন্যা সুযৌবনা, দেবদাসীদের দেখা থেকেই মহামান্য অতিথির চোখের চাহনি বদল হতে দেখেছেন তিনি। কিন্তু দশরথের চিত্তবিনোদনের জন্য এরকম হাজার রমণী অযোধ্যায় প্রতিদিন তার সেবায় নিযুক্ত। ললনাপ্রিয় দশরথের নিজস্ব প্রমোদকক্ষে এরকম আকর্ষণীয়া রূপরম্যা, লাস্যময়ী তরুণীর অভাব নেই। অনাবরণ দেহের অপরিসীম সৌন্দর্যে ভরপুর যৌবন চিহ্নগুলি উন্মুক্ত করে রাজার সম্মুখে নৃত্য করে তারা। সে নৃত্য আরো উত্তেজক, আরো চিত্তবিভ্রমকারী। প্রমোদ গৃহের ঝাড় বাতির আলোয় তাদের অনাবৃত আশ্চর্য যৌবনশ্রী অগ্নিশিখার মতো জ্বলে। কামনা-লালসা লেলিহান শিখার মতো লকলক করে তাদের সর্বাঙ্গে। উষ্ণ জলের স্রোতের মতো তরলিত কামনা মোমের মতো গলে গলে পড়ে রক্তে। সুতরাং-এ উত্তেজনা, আনন্দ, রোমাঞ্চ দশরথের কাছে নতুন কিছু নয়। এসবে তার মন অভিভূত হলেও হৃদয় বিকল হওয়ার কথা নয়। এসব একঘেয়ে আনন্দ উপভোগের মধ্যে কোন চমৎকারিত্ব নেই। তাহলে দশরথ অন্যমনস্ক কেন? কি হয়েছে তার? আকস্মিক কোন অসুস্থতার জন্য কি এরূপ চিত্তবৈকল্য? ভেবে কুল-কিনারা করতে পারলেন না অশ্বপতি। অবশেষে, "কে জানে? দূর ছাই!" করে দশরথকে নিয়ে মাথা ঘামানো বন্ধ করলেন। আত্মরক্ষার মগ্নতাকে অন্যমনস্কতার রূপ দেবার জন্য অশ্বপতি পথের দু'ধারে চলমান শোভার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

সাঁ সাঁ করে বাতাসের ঝাপটা লাগছিল দশরথের চোখে, মুখে, নাকে, কানে। হাওয়ায় তার চুলগুলো উড়ছিল। মাঝে মাঝে হাত দিয়ে মাথার মুকুট ঠিক করছিল। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীতল হল দশরথের দেহ। স্নায়ুর চাপ হ্রাস পেল। ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়গুলো সজীব ও ক্রিয়াশীল হল। গভীর বিষাদের বরফ গলতে সুরু করায় মুখের মালিন্য গেল কেটে। মনের মধ্যে একটা খুশি খুশি ভাব জাগল। কিন্তু মস্তিষ্কের মধ্যে তখনও নানা চিন্তা এ জিজ্ঞাসার ভিড়। সহসা কৌশল্যার মুখখানা তার মনের পটে ভেসে উঠে মিলিয়ে গেল। কারণ, ওই চিন্তার মধ্যেও আশ্চর্য রকমভাবে একটা ইন্দ্রিয় সজাগ ছিল। বিদ্যুৎ চমকের মতো কৈকেয়ীর তন্বী সুঠাম অবয়বের নিটোল সুন্দর প্রতিমার মতো মূর্তিটি বারংবার চোখের তারায় ঝলকিয়ে উঠল।

যে পথ ধরে রথ যাচ্ছিল, সেই পথের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দশরথ অন্যমনস্ক হয়ে মাথা নাড়ছিল। নিজেকে প্রশ্ন করছিল আর নিজের মনেই তার একটা কাল্পনিক উত্তর সন্ধান করছিল। পঞ্চদশী কৈকেয়ী রক্তের শিরায় শিরায় কী তার মতো গলিত আগুনের স্রোত বইছিল? থরথরিয়ে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল তার শরীরের ভিতর বাহির? কৈকেয়ীকে তার কেমন নির্লিপ্ত, নির্বিকার, অসহায় মনে হচ্ছিল। তথাপি একটা অসহিষ্ণুতা পীড়া দিচ্ছিল তাকে। চোখের তারায় ছিল একটা অব্যক্ত জিজ্ঞাসার প্রশ্ন, কেমন একটা ভীরু দ্বিধার ছায়া। আসলে তা ভীরুতা নয়। সে হল পঞ্চদশী তরুণীর প্রেমের সরস সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি। আধো অন্ধকার বিগ্রহের পিছনে কৈকেয়ী তার ডান হাত মুঠো করে ধরেছিল। আর তাতেই তার থরথরিয়ে উঠেছিল বুক। কৈকেয়ীর ভীরুতা ছিল, দ্বিধা ছিল, কিন্তু তার আশ্চর্য উজ্জ্বল দুটি চোখ প্রেমানুভূতির তীব্রতায় জ্বলজ্বল করছিল। ঠোঁটে তার কথা বলার শক্তি ছিল না কিন্তু মুখখান দুরন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল। কৈকেয়ী চুপি চুপি স্বরে ডাকল : 'মহারাজ!' সে ডাক শুনে নিজেই চমকে উঠেছিল সে। ভাললাগার প্রতিবন্ধকতাকে জয় করার একটা দুর্জয় সাহস দেখিয়েছিল কৈকেয়ী। আনন্দ বিস্ময় এবং একটি সূক্ষ্ম সহানুভূতিবোধ তার চোখ মুখের অভিব্যক্তিতে ফুটেছিল। অতএব সে এখন নিঃসন্দেহ যে, কৈকেয়ী ভালবাসে তাকে। তাহলে কেকয়রাজ অশ্বপতির কাছে মনের বাসনা প্রকাশ করতে বাধা কোথায়? বাধা একটা নয়, অসংখ্য বলে মনে হল দশরথের। নিষেধের প্রতিমূর্তি কেকয়রাজ এখন তার কাছে বাস্তব সত্য। তাঁর কাছে কৈকেয়ীকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া এক কঠিন কাজ। স্বাভাবিকভাবে তাদের বিবাহ হয় না। বর্ণভেদ, জাতিভেদ, বয়স, পরিবেশ, সময় সব নিয়ে এ বিবাহ অসঙ্গত এবং অসিদ্ধ। বাধার কথা মনে হতে বুকের ভেতর তার কাঁটা ফোটার যন্ত্রণায় টন টন করে উঠল। মস্তিষ্কের বন্ধ কুঠুরির মধ্যে খঞ্জনির মতো বাজতে লাগল একটা চিরন্তন জিজ্ঞাসা; কৈকেয়ীকে পাবে

না কেন? কৈকেয়ীর কাছেই বা তার শূন্য জীবনের মূল্য কোথায়? কান্নারুদ্ধ হৃদয়ের এক রুদ্ধ আবেগে নিজের মনে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, ভয়ঙ্কর সাধ পূরণের জন্য যুদ্ধ যদি অনিবার্য হয় তবুও কৈকেয়ীর উপর তার দাবি ত্যাগ করবে না। বীর্যের গর্বে পুরুষ নারীকে চায়। দাবির নীতি মেনেই বীর্যবান পুরুষ কেশরফোলা সিংহের মতো গর্জন করে আক্রমণের সংকেত দেয়। সে রকম কিছু একটা করার অভিপ্রায় নিয়ে সে অশ্বপতির দিকে তাকাল। চোখে তার ভাবলেশহীন দৃষ্টি। দৃষ্টিতে কোন প্রশ্ন ছিল না। ছিল শুধু একটা সেতু স্থাপনের প্রয়াস। সে সেতু তার নিজের কূল থেকে অশ্বপতির তীরে ওঠা।

দশরথ জানত না সে নিজেই অশ্বপতির জিজ্ঞাসার স্রষ্টা। অশ্বপতির দিকে তাকাতেই তাঁর চোখের তারায় অবাক বিস্ময় আর কৌতূহলিত রহস্যের দ্যুতি দেখতে পেল। দশরথের নিজের প্রাণও তাতে দ্যুতিময় হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে তার অভিভূত আচ্ছন্নভাব দূর হল। দশরথের চোখে শঙ্কা, দ্বিধা কিছুই ছিল না। দুজনের চোখাচোখিতে ঠোঁটের অগ্রভাগে ঈষৎ অপ্রস্তুত হাসি বর্তুল হয়ে উঠল।

দশরথের কথা বলার আগেই অশ্বপতি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বললেন : মহান বন্ধু অযোধ্যাপতি আপনি কি কোন শারীরিক আস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছেন? আমার আতিথেয়তার কি কোন ত্রটি হল? আপনার শরীর ঠিক আছে তো? আপনাকে সারাক্ষণ অত্যন্ত বিমর্ষ চিন্তিত দেখে আমি যারপরনাই অশান্তি ও উদ্বেগ বোধ করেছি। এখন অনুগ্রহ করে বলুন আপনার কি হয়েছে? আপনার কোন কাজে আমি লাগতে পারি?

অশ্বপতির সহৃদয় আন্তরিকতায় মুগ্ধ ও অভিভূত হল দশরথ। সহসা কোন কথা বলতে পারল না। দ্বিধা সংকোচ কাটাতে আরো কিছু সময় লাগল। তারপর হাসি হাসি মুখ করে সকৌতুকে বলল : কেকয় রাজ্যে পা দিয়ে আমার জীবনের হিসাবের গরমিল দেখতে পেলাম। অঙ্কের উত্তর মেলাতে পারছি কৈ? মহারাজ হয়তো কিছু সূত্র সন্ধান দিতে পারবেন। আপাতত এই সাহায্যটুকু পেলেই তৃপ্ত হব।

অশ্বপতির চোখের ছটায় কৌতুক ঝিলিক দিল। একটু হাসার চেষ্টা করলেন। অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসা তাঁর স্বরে বাজল। বললেন : ভারি মজা তো!

দশরথ চোখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বলল! সত্যিই তাই।

অশ্বপতি গভীর মনোযোগের সঙ্গে তার দিকে তাকাল। দশরথের মুখে রঙের ছোপ লাগল। চোখের তারায় নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করছিল কৈকেয়ীর প্রদীপ্ত যৌবনরূপ। বুকের ভেতর বাজতে লাগল কৈকেয়ীর মধুস্রাবী কণ্ঠস্বর। সুখের অনুভবে দশরথের চেতনা কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হয়ে রইল।

দেখতে দেখতে রথ রাজপ্রাসাদের চত্বরে প্রবেশ করল। সিংহদ্বার পেরিয়ে অতিথির গৃহ সংলগ্ন প্রাঙ্গণের সামনে দাঁড়াল।

অশ্বপতি দশরথকে আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে কক্ষে নিয়ে গেলেন। ঐ সামান্য পথটুকু অতিক্রম করার সময় দশরথের বুকের উপর দুরন্ত ঝড় বয়ে গেল। উপকূলের বুকে আছড়ে পড়া ঝড়ের মতো অশান্ত অবস্থা তার। এই মুহূর্তে তার কর্তব্য কি, ভেবে স্থির করতে পারছিল না। কেমন করে কথাগুলো শুরু করবে? কি করলে সব দিক রক্ষা হয়, তার কথা চিন্তা করে আকুল হল। বিভ্রান্ত অসহায়তাবোধে তার পা কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল, পায়ের নীচে মৃদু ভূকম্পন হচ্ছে। আসলে হৃদয়ের মধ্যে অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন হচ্ছিল।

কথা বলতে গিয়ে গলা শুকিয়ে গেল। জিভ দিয়ে শুকনো জোড়া লাল ঠোঁট দুটো ভেজানোর চেষ্টা করল। কিন্তু জিভও তার অস্বাভাবিক শুকনো। ঠোঁট থর থর করে কাঁপছিল। প্রদীপ শিখার মতো কাঁপছিল জ্বলজ্বল চোখের চাহনি। কেমন একটা অসহায় আর্তি ফুটে উঠেচিল সেখানে।

অশ্বপতি স্থির দৃষ্টিতে দশরথের হাবভাব লক্ষ্য করলেন। তারপর দেয়ালের ছবিগুলো একটা একটা করে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। উদ্দেশ্য দশরথের অসমাপ্ত মনের কথা শোনা। সেজন্য মনেতে তাঁর অধীর ব্যগ্রতা। কিন্তু ঘূণাক্ষরে তাঁর মনের ভাব দশরথকে বুঝতে দিলেন না। এধার ওধার

STATE CENT
11th Fin

করে আরাম কেদারায় উপবেশন করলেন।

বেল, জুঁই ফুলের গন্ধে ঘর ভরেছিল। অশ্বপতি হাঁটুর উপর পা তুলে দিয়ে শিকারীর মতো তীক্ষ্ণ চোখ মেলে দশরথকে দেখতে লাগলেন। মুখের অভিব্যক্তিতে তাঁর একটা হাসি হাসি ভাব। চোখে চোখ পড়তে দশরথ হাসল অপ্রতিভের মতো। জড়তা এবং ভয় ভয় ভাবটা দূর হল। অসংকোচে বলল : মহামান্য অশ্বপতি, বাইরে দেখে মানুষের অন্তরের সব পরিচয় আঁচ করা যায় না। আমার বুকের ভেতর লুকোনো কান্নার কণ্ঠস্বর হঠাৎ হর-পার্বতীর মন্দিরে বুক চিরে বেরিয়ে এল। সেই প্রথম অনুভব করলাম, অন্তরে কী ভীষণ রিক্ত আমি! আর শূন্যতা আমাকেই ব্যঙ্গ করল। অথচ কি আর বয়স হয়েছে আমার! যৌবনসীমা উত্তীর্ণ করলেও এখনও আমি অমিত বীর্যসম্পন্ন পুরুষ সিংহ। দেহে তারুণ্যেব দীপ্তি, বুকে সাগরের উচ্ছ্বাস। আঁখির কটাক্ষে মদনের মোহনধনু, কণ্ঠে কোকিলের প্রগলভতা, হৃদয়ে ঝিল্লীর ধ্বনি। এসব অনুভবের কথা। একে ব্যাখ্যা কিংবা বিশ্লেষণ করা দায়।

দশরথের অকারণ আবেগের কোন উত্তর অশ্বপতির জানা ছিল না। প্রয়োজন থেকে আলাদা করে নেওয়া এই সব কথার অর্থ তার মনে অসংখ্য প্রশ্ন জাগাল। মানুষের মন এক অদ্ভুত চিত্রকর। চেনা মুহূর্তগুলির এক আশ্চর্য সুন্দর ছবিই সে মনের পটে ফুটিয়ে তোলে। কত অদ্ভুত ঘটনার বিস্ময়কর কল্পিত দৃশ্য সে সব। বিশেষ অবস্থায় বিশেষ মুহূর্তে প্রত্যেক মানুষের এই রকম একটা ভাবাবেশের সৃষ্টি হয়। এটা তার অন্তরের গোপন দুঃখের অথবা গোপন সুখের অনুভূতি থেকে হয়। দশরথও সেরকম কোন দুঃখ বা সুখের অনুভূতি বলতে ব্যগ্র বলে মনে হল অশ্বপতির। তাই কথা বলার সময় তার চোখ মুখের এক আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে গেল। চোখের দৃষ্টি সুদূর, নয়নের রূপ সুন্দর, কণ্ঠের স্বর মধুর আর ভরাট। অশ্বপতি কিছু বুঝতে না পেরে তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বিভ্রান্ত স্বরে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন : মাঝে মাঝে সব মানুষ কেমন যেন দার্শনিক হয়ে যায়। এই অকারণ বিহ্বলতা তার মনের বিলাস।

দশরথের বিস্ফারিত চোখের তারা দুটি অশ্বপতির চোখের তারায় স্থির হল। মনের ভেতর অনেক উল্টোপাল্টা যুক্তিহীন কার্যকারণ কথার প্রতিক্রিয়ার একটা ঝড় বয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ তার বাহ্যচেতনা লুপ্ত ছিল। মনের গভীরে ডুবে গিয়ে অন্যমনস্কভাবে বেশ কয়েকবার মাথা নাড়ল। আস্তে আস্তে সম্মোহিতের মতো গভীর গলায় বলল : মহামতি অশ্বপতি! এ এক অন্য অনুভূতি। নিজেকে বড় একা, নিঃসঙ্গ মনে হয়। নিরানন্দ জীবনের অর্থ কি? বেঁচে থাকার কোন মানেই হয় না। কেন, এরকম, মনে হয় বলতে পারেন? কেন নিজেকে একা আর দুঃখী লাগে?

অশ্বপতি বিব্রতবোধ করলেন। হঠাৎ একটু দিশাহারা বোধ করে চুপ করে রইলেন। তারপর দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বললেন : এ প্রশ্নের জবাব আমি কি দেব? কতটুকু বা জানি? ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং নিকট আত্মীয় ছাড়া এ প্রশ্নের মীমাংসা করা শক্ত।

দশরথের চোখে ব্যথা ঘনাল। কণ্ঠস্বরে মিনতি ঝরল। বলল : তবু, আপনি বলুন। নিজেকে আমার কেন এত একা লাগে? কেন মনে হচ্ছে আমার কেউ নেই?

অশ্বপতি নির্বিকার মুখে প্রশ্ন করলেন : কেন হয় আপনি জানেন না?

না, কেবল মনে হচ্ছে প্রগাঢ় যন্ত্রণা আমার বুকের মধ্যে থাবা গেড়ে বসেছে।

অশ্বপতি দশরথকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। শান্ত ভাবলেশহীন দুই চোখে তাঁর অদ্ভুত প্রশ্ন। দ্বিধায় ভুরু কুঁচকে গেল তাঁর। বিব্রত স্বরে বললেন : মহারাজ, আপনার এই অনুভূতির মধ্যে কোন গভীর দার্শনিকতা নেই। প্রবৃত্তির তাড়না আপনাকে এমন অন্যমনা এবং চঞ্চল করে তুলেছে। পুত্রহীনতার দুঃখ আপনার এই একাকীত্ববোধের জন্য দায়ী। আপনার ভার্যা আছে, রাজ্য, ঐশ্বর্য আছে, কেবল নেই তার উত্তরাধিকার। তাই, এই সুতীব্র যন্ত্রণা। অর্থ, ঐশ্বর্য, আরাম, বিলাস, ব্যসন খ্যাতি মানুষের বহিরঙ্গকে ভরিয়ে রাখে কিন্তু অন্তরে সে দীন হতে দীন!

দশরথ অবাক স্বরে প্রশ্ন করল : এসব আপনি কি বলছেন?

মহারাজ আপনার স্পর্শকাতর ও সযত্ন গোপন স্থানটির সন্ধান করে আমি যা অনুভব করছি,

তাই আপনাকে বললাম। পুত্রহীনতার কষ্ট আপনাকে এই যন্ত্রণা দিচ্ছে। মানুষের জীবনে যত দুঃখ এবং যন্ত্রণা তার উৎপত্তির উৎস প্রবৃত্তির গভীরে। অক্ষমতা ব্যর্থতার সঙ্গে দুরন্ত ইচ্ছার বিরোধ যন্ত্রণা দুঃসহ হয়ে ওঠে। প্রতিরোধের প্রাচীর যখন ভেঙে পড়ে তখন ব্যক্তিত্বের অন্তরালে মনের এই ক্ষয় চলে। মানুষ পশুর মতো দেহসর্বস্ব জীব নয়। সন্তান সন্ততির মধ্যে সে তার বংশধারা রক্ষা করতে চায়। তাই প্রত্যেক নারী ও পুরুষ সন্তান চায়। সন্তান তার প্রতীক। মৃত্যুর পরেও যে তাদের ঐশ্বর্য কৃষ্টি বহন করে নিয়ে যাবে আর এক কালে। এই ভাবে ব্যক্তি তার সন্তানের ভেতর দিয়ে নতুন করে বেঁচে উঠে; সমাজ, ধর্ম, পরিবারকে নতুন প্রাণ দেয়। এইখানেই তার জীবনের সার্থক জয়যাত্রা। সেই যাত্রাপথের যখন বিঘ্ন ঘটে তখন মানুষের মনের গভীরে শ্মশানের চিতা জ্বলে। পুত্রহীনতার দুঃখ আপনার এই একাকীত্ববোধ ও পরিজনহীনতাবোধের জন্যে দায়ী। ভার্যা, রাজ্য, ঐশ্বর্য, ধন, সম্পদ কোন কিছুর অভাব আপনার নেই তবু মন আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না। তাই এই বিলাপ।

দশরথ চুপ করে রইল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে ধীরে ধীরে বলল : মহামতি অশ্বপতি এসব কথা এত গভীর করে কোনদিন স্থির চিত্তে ভাবিনি। আজ মনে হচ্ছে, ক্ষুধার্ত প্রবৃত্তি তার শিকারকে গ্রাসের সম্মুখে রেখে বসে আছে। সংকোচে আহার করতে পারছে না। যদিও হিংস্র থাবা মেলে প্রবৃত্তি গ্রাস করতে চাইছে তাকে। কিন্তু একটা সূক্ষ্ম কুণ্ঠা, সৌজন্য বোধের বাধা কাটিয়ে উঠতে না পারায় তীব্র যন্ত্রণা তার স্নায়ুতে ছড়িয়ে পড়ছে।

অশ্বপতি কোন কিছু না ভেবেই বলল : মহারাজ, ক্ষুধার আকর্ষণ স্বাভাবিক ও প্রকৃতি অনুমোদিত। সন্তান ক্ষুধা মানুষের জীবনে সর্বাপেক্ষা আবেগবান বৃত্তি। জীবনের নতুন অঙ্গীকার নিয়ে চলার পথে একধাপ এগিয়ে যায় মানুষ, মানুষের সমাজ। বেঁচে থাকা ও বেড়ে ওঠার তাগিদে আপন প্রাণশক্তিতে দুর্দমনীয় হয়ে সে সৃষ্টি করে, নতুন হয়ে গড়ে ওঠে আপন সন্তানের মধ্যে। সৃষ্টির এই আবেগ শুধু দেহগত নয় মনোগতও বটে।

অশ্বপতির কথা শুনতে শুনতে দশরথের তনু মন রোমাঞ্চিত হল। সৃষ্টিতত্ত্বের এবং শরীরতত্ত্বের এই অদ্ভুত নিয়মটা সে জানত না বলে আশ্চর্য হল। অশ্বপতির কথা থেকে প্রথম অনুভব করল জীবনধারণ ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যেমন ক্ষুধা নিবৃত্তির প্রয়োজন সে রকম প্রকৃতি তার সৃষ্টি রক্ষার স্বার্থে জীবের মধ্যে যৌন আবেগের আকর্ষণকে দুর্জয় করে তুলেছে। কিন্তু সব ভুলে যাওয়া, ডুবে যাওয়া আনন্দ আস্বাদনের মধ্যে সন্তান সৃষ্টির এষণার চেয়েও একটা দুর্লভ অব্যক্ত দৈহিক আনন্দ সুখ ও অনির্বচনীয় তৃপ্তি ও উত্তেজনা পাওয়ার জন্য মানুষ মিথুনাসক্ত হয়। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আনন্দ উত্তেজনাতেই দশরথ নারী চেয়েছে এবং পেয়েছে। কিন্তু অশ্বপতি হঠাৎ তার সব হিসেব এবং ধ্যান জ্ঞান ওলোট-পালোট করে দিল। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে দশরথ প্রশ্ন করল : মহান রাজা অশ্বপতি, আমার বিকল চিত্তের উৎস তা হলে নারী। নারীর মধুর সাহচর্য আমাকে সন্তানের জনক করবে, মনের কষ্ট লাঘব করবে, আমায় পরিপূর্ণতা দেবে। উত্তরকালের বুকে আমার চিরচিহ্ন যে এঁকে রাখবে তাকে কেমন করে পাব আমি? আপনার কাছেই বা কিরকম সাহায্য প্রত্যাশা করতে পারি?

বলতে বলতে দশরথের দুই চোখের দৃষ্টি দীপ্ত হল। মুখে খুশির ঝলক লাগল। ঠোঁটের কোণে বিচিত্র হাসির ধার তার ব্যক্তিত্বকে বিশিষ্ট করে তুলল। অশান্ত তৃষ্ণা তার সংযম ভাসিয়ে দিল। কৈকেয়ীর মুগ্ধতা তাকে প্রগলভ করল। নিজের সঙ্গে কৌতুক করে বলল : আঁখির কটাক্ষে মদনের মোহনধনুর নিশানা এখনও অব্যর্থ। পাহাড়ী ঝর্নার উচ্ছল তারুণ্য আমার শরীরে ক্রীড়াচঞ্চল। বক্ষে আমার মত্ত মধুপের প্রেমের গুঞ্জন। আমার রূপ যৌবনের কোন ঘাটতি নেই। এখনো দাদুরীর আচমকা ডাকে আমার হৃদয় উতলা হয়। মুগ্ধতা প্রত্যাশার ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে যায়। আশা জাগায়। তৃষ্ণা বাড়িয়ে তোলে।

দশরথের সারা মুখে আবেগের অভিব্যক্তি। কথাগুলি অসংলগ্ন। প্রকাশের ভাষা প্রলাপের মতো। আসলে কিসের একটা দ্বিধা দ্বন্দ্ব অনতিক্রমনীয় বাধার মতো তার কণ্ঠরোধ করল। তাই এক চিরজিজ্ঞাসার কাছে সে উৎকর্ণ, বোবা।

আশ্বপতি চমকাল। চোখে তাঁর সন্দেহ এবং অনুসন্ধিৎসা। মুখে আতঙ্কের ছায়া। ঘটনার

আকস্মিকতা অনেকটা মেঘে ঢাকা ছায়ার মতো মনের দিগন্ত জুড়ে রইল। প্রকৃতপক্ষে, কৈকেয়ী সম্পর্কিত এক অজ্ঞাত ভাবনা তাঁকে বিমর্ষ করল। তাই, দশরথের কথায় কোন জবাব দিলেন না। নিজের বিমর্ষ চিন্তায় অন্যমনস্ক হতে গিয়ে দেখলেন দশরথের মুখ।

নীরবতা অনেক সময় বার্তা থেকে তীব্র এবং গভীর। অশ্বপতির বিহ্বল বিভ্রান্ত নিবিড় দৃষ্টি দশরথের অনুভূতিতে যা কিছু ক্রিয়া করছিল তা যেন এক ধাক্কায় মনের গভীরে অটল বাধার প্রাচীর ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে নিজের কথা বলতে তার কোন কুণ্ঠা হল না। দশরথের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ। বলল ঃ রাজকন্যা কৈকেয়ীকে দেখা থেকে মন আমার উতলা হয়েছে। কেকয় রাজ্যের মাটি থেকে আমি নির্মল সুন্দর এই মুক্তোটি কেড়ে নিয়ে আমার প্রেমের মালা গাঁথব। আমার প্রার্থনা পূরণ করে কৃর্তার্থ করুন। কেকয় রাজ্যের সঙ্গে অযোধ্যার আত্মীয়তা, রাজনৈতিক দিক থেকেও প্রয়োজন।

বিদ্যুৎ চমকের মতো চমকাল অশ্বপতি। দুই চোখে তার ক্রোধ ঝিলিক দিল। প্রায় আর্তস্বরে প্রতিবাদ করে বলল : অসম্ভব!

নির্বিকার কণ্ঠে দশরথ প্রশ্ন করল—কেন? বাধা কোথায়?

অশ্বপতি বললেন : বর্ণে গোত্রে আমরা এক নই। আমাদের বিবাদ আজন্ম।

এ হল ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ। আসলে আমরা কশ্যপের বংশধর। বিভেদ কলহ শুধু বাইরের ঘটনা। বার মহল ছেড়ে ভিতর মহলে ঢুকলে এ সব তুচ্ছ মান অভিমানের জটিলতা আর থাকবে না।

তবু পারি না।

মহান অশ্বপতি, দশরথ তার পাওনাকে কখনও ভিক্ষে করে না। তবু প্রেমবশে হাত পেতে সে যা চাইল তা থেকে যদি বঞ্চিত হয় তা হলে বীর্যের গর্বে, পাশব পৌরুষবলে তাকে অধিকার করে। কিন্তু এখান তার প্রয়োজন নেই। আমি জানি, অতিথিবৎসল রাজা, অতিথির সুখ ও তৃপ্তির জন্য নিজ কন্যাকে যখন তার আপ্যায়নে নিযুক্ত করেছেন, তখন অতিথির প্রার্থনা পূরণে বাধা সৃষ্টি করে অনর্থক আতিথ্যের অপমান করবেন না। এতে কেকয়রাজ্যের সুনাম ও সুযশ হানি হবে। অযোধ্যাপতির দাবিকে ভাগ্যের পরম প্রসাদ বলে মনে করা উচিত। রাজনৈতিক প্রয়োজনে কেকয় এবং অযোধ্যার মধ্যে একটা স্থায়ী সম্বন্ধ গড়ে ওঠা আবশ্যক। আত্মীয়তার সেই সুযোগ অযাচিতভাবে আমরা পেয়েছি।

দশরথের নরম গরম মেশানো ভাষণে অশ্বপতি বিস্ময়ে হতবাক হলেন। অপলক দুটি চোখে তাঁর মুগ্ধতা নামল। শান্ত গলায় বললেন : কৈকেয়ী কিশোরী। অপরিণত বালিকা।

শিশুকাল থেকে নারীজাতি জননী, গৃহিণী, প্রণয়িণী, প্রিয়ভাষিণী, সেবাপরায়ণা। নারীর সব লক্ষণগুলি কৈকয়ীর দেহে মনে পরিস্ফুট। আমি চাই তার মন, প্রাণ, আত্মাকে। তার সান্নিধ্য আমাকে দু'দণ্ডের শান্তি দিয়েছিল।

অশ্বপতি স্তব্ধ বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে দশরথের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। নিঃশব্দে কিছু মুহূর্ত অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এই সময়টুকুতে অশ্বপতির মস্তিস্কের মধ্যে অনেকগুলো কথা একসঙ্গে জেগে উঠল। দশরথের এই আবেগ তার মুগ্ধতা থেকে সঞ্চারিত। আবেগের নির্ঝরিণীতে তার মন প্রাণ প্লাবিত। কৈকেয়ীর রূপের ঝলক লেগে তার চোখ মন ধাঁধিয়ে রয়েছে। ভালমন্দ বিচারবোধ লুপ্ত হয়েছে। মুগ্ধতার আবেশ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করতে ও পরিস্থিতির বাস্তবতায় প্রত্যাবর্তন করতে জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন : মহারাজ অজপুত্র যদি একান্তই আমার কন্যার পাণিপ্রার্থী হন, তা হলে কুলপ্রথানুসারে আপনাকে কতকগুলি শর্ত পালন করতে হবে। আপনি রাজি হলে তবে এই বিবাহ অনুমোদন করা যেতে পারে।

কি সে শর্ত?

প্রতিশ্রুতি ছাড়া তা বলা সম্ভব নয় অযোধ্যাপতি নেমি।*

* দশরথের অন্য এক নাম

দশরথ মুহূর্তের জন্যে থমকাল। পরক্ষণেই মুগ্ধতার আবেশের মধ্যেই স্বাভাবিকভাবে তার মনে হল কৈকেয়ীর জন্য সব করতে পারে সে। তাকে অদেয় কিছু নেই। শর্ত যত কঠিন হোক প্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় তাকে অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে হবে। এর সঙ্গে তার নিজস্ব মর্যাদা এবং অনুরাগের সততা জড়িয়ে আছে। এই অনুভূতি তার মনে গাঢ়তর হল। অমনি সঙ্কল্প জাগল। চোখের অপলক স্থির দৃষ্টিতে মুগ্ধ আবেগে রঙের ঔজ্জ্বল্য ঝলকিয়ে উঠল। চিন্তাহীন বিভ্রমে অশ্বপতির কথার প্রতিধ্বনি করে বলল : প্রতিশ্রুতি দিলাম।

অশ্বপতির মুখে বিচিত্র দুর্জ্ঞেয় হাসি ফুটে উঠল। শান্ত গলায় বললেন : মন্দিরের বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে গঙ্গাজল স্পর্শ করে অঙ্গীকার করতে হবে।

আমি প্রস্তুত। নির্বিকারভাবে বলল দশরথ।

শিবলিঙ্গ স্পর্শ করে দশরথ অঙ্গীকার করল। পুরোহিতের সঙ্গে যন্ত্রবৎ উচ্চারণ করল কেকয়রাজের শর্ত মেনে কৈকেয়ীর পাণিগ্রহণ করব। অন্যথা কৈকেয়ীর উপর কোন দাবি রাখব না। এমন কি বীর্যগর্বে পাশব শক্তিবলে তাকে অধিকার করব না। কখনও তার শত্রুতা করব না, শত্রুর চোখেও দেখব না।

শপথ শেষ হলে অনেকটা স্বপ্ন দেখার মতো দুটি বিস্মিত সলাজ চোখে দশরথ অশ্বপতির দিকে তাকাল। অশ্বপতি ভুরু কোঁচকাল। গম্ভীর স্বরে বলল : অপরাধ মার্জনা করবেন। পঞ্চদশী কৈকেয়ীর সঙ্গে আপনার বয়সের ব্যবধান চিন্তা করেই শর্তগুলো আমাকে আরোপ করতে হচ্ছে। আমি পিতা। সব পিতাই কন্যার সুখ, শান্তি, সমাদর এবং নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখে পাত্র নির্বাচন করে। আমিও তাদের ব্যতিক্রম নই। বহুপত্নীক অযোধ্যাপতির অন্যান্য রাণীদের মধ্যে কৈকেয়ী বোধ করি সর্বকনিষ্ঠা। স্বভাবতই তার কর্তৃত্ব উপেক্ষিত ও অবহেলিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল অথবা রাজপ্রাসাদের অন্যান্য রাণী ও রমণীর ঈর্ষার পাত্র হবে সে। কৈকেয়ীকে তাদের ঈর্ষার পাত্র হয়ে বাস করতে হবে। রাজ অন্তঃপুরে সে যাতে মর্যাদার সঙ্গে নিজের কর্তৃত্বে এবং অধিকারের জোরে বাস করতে পারে সে জন্য কতকগুলো অতিসাধারণ প্রতিশ্রুতি দিতে হবে মহারাজকে। শর্ত পালন করা, না করা মহারাজের অভিরুচি। তবে, শপথের মধ্যবর্তী হয়ে ধর্ম ও ঈশ্বর থাকলে সত্য রক্ষায় মহারাজ অবিচল থাকবে। এটাই বিশ্বাস আর কি!

দশরথের অধরে হাসি হাসি ভাব। নিজের অজ্ঞাতেই একটা আবেগ অনুভব করে বলল : নিশ্চয়ই।

অশ্বপতি মুখ টিপে হাসলেন। কিন্তু চোখের চাহনিতে তাঁর বিস্মিত জিজ্ঞাস। কৈকেয়ীর জন্য দশরথ সব কিছু করতে প্রস্তুত। এই সব ঘটনায় তার সঠিক ভূমিকা কি অশ্বপতি বুঝতে পারলেন না। দশরথের এত উন্মত্ততা কি জন্য? কোন নিষেধ শুনতে চায় না,। কেন? এই কেন'র কোন উত্তর তিনি খুঁজে পেলেন না। উদ্বেগাকুল চিত্তে বললেন : অজপুত্র নেমি; আমার জামাতা হতে গেলে কৈকেয়ীকে প্রধানা মহিষীর সম্মান দিতে হবে। * দুই; কোন পুত্রসন্তান জন্মালে তাকে অযোধ্যার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করতে হবে। অন্য কোনো সন্তানের দাবি গ্রাহ্য হবে না। অগ্রজ হলেও না। কৈকেয়ীর পুত্রের সিংহাসন নিষ্কণ্টক করতে প্রতিকূলচারী পুত্রদের নির্বাসন দিতে হবে। এই শর্তগুলি পালনে সম্মত হলে কৈকেয়ী আপনার ভার্যা হতে পারে।

শর্তের কথা শুনে দশরথ স্তম্ভিত। তৎক্ষণাৎ তার প্রত্যুত্তর দিতে পারল না। কিন্তু কৈকেয়ীর নিষ্পাপ সরল সুন্দর শান্ত স্নিগ্ধ মুখখানির অনির্বচনীয় লালিত্য ও মাধুর্য তার চোখের তারায় ভেসে ওঠল। তার সমস্ত ভাবনা চিন্তার মধ্যে এই কথাগুলো কাঁটার মতো বিঁধল। মনে হল, কৈকেয়ী প্রসঙ্গে ইতি টেনে দেবার জন্যই অশ্বপতি এই কৌশল করেছেন।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতি প্রয়োগ করে অশ্বপতি দশরথের অসন্তোষ যেমন এড়ালেন তেমনি কৌশলে কৈকেয়ীকে তার বধূরূপে পাওয়ার এক অন্তরায় সৃষ্টি করলেন। অশ্বপতির এ এক বিচিত্র

প্রসিদ্ধ রামায়ণ টীকাকার তিলক (ইনি বালগঙ্গাধর, তিলক নন) দশরথের প্রতিজ্ঞাপ্রসঙ্গে লিখেছেন : "তব পুত্র্যাং যো জনিষ্যতে তস্মৈ রাজ্যং প্রদাস্যামীতি প্রতিজ্ঞাবান্ ইত্যর্থঃ।"

রাজনীতি। আপন কন্যাকে এ কোন ভয়ঙ্কর রাজনীতির দাবা খেলায় নিয়ে এলেন তিনি? একি তাঁর ক্ষমতা দখলের লড়াই? অথবা প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির ইচ্ছা? সেই মুহূর্তে নানাবিধ জটিল প্রশ্নে দশরথের চিত্ত ভারাক্রান্ত হল।

অশ্বপতির এই ভীষণ প্রস্তাব মানতে গেলে নীতির দিক থেকে তাকে দেউলে হতে হবে। আবার না মানলে তার শপথের মর্যাদাহানি হয়। এ রকম একটা শক্ত শর্তের মারপ্যাঁচে ফেলে অশ্বপতি তার দুর্বার বাসনার গতিরোধ করবে, দশরথ স্বপ্নেও কল্পনা করে নি। এখন শর্ত মেনেই কৈকেয়ীর পাণিগ্রহণ করতে হবে। এছাড়া অশ্বপতির কূট কৌশল ব্যর্থ করার কোন রন্ধ্রপথ নেই। শর্তগুলো স্বীকার করা কোন দুরূহ ব্যাপার নয়। কেবল নিজের কাছে ছোট হওয়ার লজ্জায়, কষ্টে বুক তার চিন্ চিন্ করছিল। প্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় এটুকু ত্যাগ করতে হবে তাকে। অদৃষ্ট হয়তো ভালোর জন্য এমন একটা শপথে উৎসাহিত করল। তার কোন সন্তান নেই। কৈকেয়ী পুত্রবতী হয়ে যদি ইক্ষ্বাকু বংশের উত্তারাধিকারীর সমস্যা মীমাংসা করে তা হলে সেটা সৌভাগ্য তার। অযোধ্যার সিংহাসনে সেই হবে একমাত্র উত্তরাধিকার। সুতরাং অশ্বপতির প্রধান শর্তটি মানতে তার অপত্তি থাকার কথা নয়। সাবিত্রী উপাখ্যানের কথা মনে পড়ল। স্বামীর মৃত্যুই তাকে জননী হওয়ার পথ করে দিল। সেরকমভাবে কৈকেয়ীর সঙ্গে বিয়েটা তার জনকত্ব অর্জনের পথ যদি করে সে হবে আশীর্বাদ। অশ্বপতি এখানে নিমিত্ত। পুত্রহীনতার ব্যথা, অনুভূতি দশরথের বুকে হঠাৎ নিদারুণ হয়ে উঠল। বন্ধ্যাত্বের জন্য কৌশল্যা, সুমিত্রা সংসারধর্ম একরকম ত্যাগ করেছে। দিবারাত্রির বেশির ভাগ সময় পূজার্চনা নিয়ে কাটায়। তার সঙ্গে রাণীদের সম্পর্কও অত্যন্ত শীতল হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। আর নিজের গোপন দুঃখ ভুলে থাকার জন্য মৃগয়া এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের উত্তেজনা নিয়ে সর্বক্ষণ মেতে থাকে। কিন্তু এ যে জীবন নয়, জীবনের সঙ্গে প্রতারণা দশরথ তা অনুভব করে। একটি সন্তানের অভাবে অযোধ্যার সব শ্রী যেন অন্তর্হিত হয়েছে। অশ্বপতির কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে অযোধ্যার শ্রী যদি ফেরে তা হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কৈকেয়ী তার জীবনে অভিশাপ না হয়ে তো, আশীর্বাদ হতে পারে। দশরথের মনের আকাশে যে মেঘ জমেছিল, তা একটু একটু করে ফিকে হয়ে গেল। লোভ, স্বার্থপরতা কর্তব্যহীনতার কথা ভেবে সে একটু ভয় পেয়ে ছিল যা। এখন আর কোন দুর্ভাবনা নেই। মনে মনে স্থির করে ফেলল অশ্বপতির প্রস্তাবে রাজি হবে। কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতার পর দশরথ ধীরে ধীরে বলল : আমি কৈকেয়ীকে চাই। তাকে সমাদরেই রাখব। রাজমহিষীর মর্যাদা দেব। তার পুত্রই অযোধ্যার রাজা হবে। ঈশ্বরের নামে শপথ করে তিন সত্যি করলাম। কিন্তু আমারও একটা শর্ত আছে। আপনি ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি এই প্রতিশ্রুতির কথা জানবে না।

অশ্বপতি চমকালো। অভিভূত আচ্ছন্নতায় প্রস্তরীভূত অবস্থা তাঁর। দশরথের চোখের উপর নীরব বিস্মিত চোখ রেখে নিদ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তির মতো বিড় বিড় করে বললেন : প্রতিশ্রুতি দিলাম, অন্য কেউ জানতে পারবে না।

সাফল্যের গৌরবদীপ্তি দশরথের চোখে মুখে উজ্জ্বল হল। আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। হাসি হাসি মুখে কৌতুক ভাব। ধীরে ধীরে বলল : এবার আমার কিছু বক্তব্য আছে।

বক্তব্য! বিস্ময়ের পরিসীমা রইল না অশ্বপতির। অঙ্গীকারবদ্ধ দশরথের কোন প্রশ্ন কিংবা কোন দাবি থাকতে পারে অশ্বপতি ভাবতে পারেননি। ভেবেছিলেন ভাগ্যের স্রোত তাঁর দিকে বইছে। উচ্চাশার সিঁড়িগুলো একটা একটা করে উঠেছেন তিনি, এখন সেই সিঁড়ি দশরথ তাঁর কাছ থেকে কৌশলে সরিয়ে নিচ্ছে মনে করে অসহিষ্ণু উত্তেজনায় অস্থির হলেন। মনের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা অনুভূতিতে প্রতিক্রিয়াশীল হল। এস্ত ব্যাকুলতায় প্রশ্ন করলেন : একবার অঙ্গীকারের পর আর কোন শর্ত থাকে না।

দশরথের দুই চোখে কৌতুক অধরে মধুর হাসি। মৃদুস্বরে বলল : শর্ত! শর্তের কথা বলব

কেন?

তেমনি ব্যস্ততার সঙ্গে অশ্বপতি বললেন : শর্তের কথা যদি ঘুরিয়ে হয়। তা-হলে মানব না।

দশরথ নম্র কণ্ঠে বলল : আশ্চর্য লোক আপনি। এত দাবি পূরণ করেও আপনার মন পেলাম না। আপনার সব দাবি পূরণ করেছি। প্রেমের জন্য আমি কি না করেছি, আপনি আমাকে দিয়ে দাসখৎ লিখে নিয়েছেন, তবু আপত্তি করেনি। কিন্তু এখনও আপনার মনে সন্দেহ, অবিশ্বাস, প্রতিশ্রুতিভঙ্গের আশঙ্কা। কেন?

অশ্বপতি নম্রহাসির সঙ্গে বললেন : জাত, ধর্ম, ভাষা, আঞ্চলিক গোষ্ঠী এসব বিভিন্নতার জন্যই আমার এই উৎকণ্ঠা। একটা পরিষ্কার বোঝা-পড়া, আমাদের আন্তরিকতাকে দীর্ঘস্থায়ী করবে। আর্যদের রহস্যময় রাজনীতির খেলায় আমরা ঠকেছি, বারংবার হেরেছি, আবার কষ্ট করে জিতেছি। জোর করে নিজেদের দাবি ও অধিকার কায়েম করেছি।

কিন্তু আমিও চাই আপনার কাছ থেকে সহযোগিতার অঙ্গীকার। আমি যেমন আপনর সব কিছু মেনে নিয়েছি, আপনারও উচিত আমার মান-সম্মান পুরোপুরি বাঁচানো।

আপনার ভূমিকা আমি একেবারেই বুঝতে পারছি না।

না বোঝার মতো কিছু নেই। শর্ত নয়, আপনার পূর্ণ সহযোগিতা।

তারপর হাসি হাসি মুখ করে দশরথ বলল : আমার মান-সম্মান সব তো আপনাকে সঁপে দিয়েছি। আপসোসের কারণ না হয়, এমন কিছু করুন।

সহসা হৃষ্ট হয়ে অশ্বপতি বললেন : বেশ, আমিও অঙ্গীকার করছি সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত করব না।

অশ্বপতির কণ্ঠের শেষ রেশটুকু কক্ষের মধ্যেই ছিল। মিলিয়ে যাওয়ার আগে দশরথের ওষ্ঠে এক অনির্বচনীয় হাসি ফুটল। কূট রাজনৈতিক চালে যে অশ্বপতি বাধা পড়ল, এ অনুভূতি তার ছিল না। মানুষের মনের গতি, অনুভূতি, প্রতিক্রিয়া পরিমাপ করার একটা সহজাত ক্ষমতা দশরথের ছিল। তাই প্রেম ও কর্তব্যবোধের যে সংকট সৃষ্টি হল তার আশু মীমাংসার জন্য বিবাহকে ত্বরান্বিত ও দ্রুত করার প্রয়োজন তীব্র হল। এই বিবাহ দশরথের কাছে খুবই জরুরী এবং রাজনৈতিক।

কৈকেয়ীকে সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মাবর্তের যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা তার। এক ঢিলে দুই পাখি মারার কৌশল আর কি! কেকয় রাজকন্যা দশরথের প্রিয়তমা মহিষী হয়ে তার সঙ্গে রথে অবস্থান করছে জানলে দস্যু শম্বর আশ্চর্য হবে। প্রিয়বন্ধু অশ্বপতি স্বার্থে, লোভে প্রভুত্ব অকাঙ্ক্ষায় তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, একথা জানলে, ভীষণ হতাশ হবে সে। তার মনোবল ভেঙে পড়বে। ক্রোধে, দুঃখে, অভিমানে তার মন যত পুড়বে তত যুদ্ধে দিশাহারা হবে। তাকে পরাজিত করা তখন কঠিন হবে না। তা-ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেকে প্রদর্শন করার একটা সুযোগও সে পাবে। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরেরা সুন্দর। সেখানেই তারা শৌর্য, বীর্য, দীপ্ত ব্যক্তিত্ব, তেজ সাহস পৌরুষ বেশি করে প্রদর্শন করে। ব্রহ্মাবর্তের যুদ্ধে পঞ্চদশী কৈকেয়ী তাকে বেশী করে পরিমাপ করতে পারবে! আর তাতেই তার প্রতি কৈকেয়ীর ভালবাসা দ্বিগুণ হবে। আসক্তি তীব্র হবে।

এইরকম একটা অনুভূতির তাড়না তাকে নেশার মতো পেয়ে বসল। রুদ্ধনিঃশ্বাসে বলল : এক প্রহরের মধ্যে হরপার্বতীর মন্দিরে কৈকেয়ীর সঙ্গে আমার বিবাহ সম্পন্ন করার সব আয়োজন করুন। প্রহরান্তে আমাকে ব্রহ্মাবর্তে যাত্রা করতে হবে। কৈকেয়ী আমার সহযাত্রিনী হবে। প্রিয়তমা মহিষীরূপে সে সর্বদা আমার পাশে পাশে থাকবে। আমার লক্ষ্যের ধ্রুবতারা হয়ে সে জ্বলবে।

সে কি? আকাশ থেকে পড়ল অশ্বপতি। বলল : বিয়ে বলে কথা! না, না, এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ এত সত্বর কেমন করে সম্ভব? ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে গোছের কথা বললে কি রাজকন্যার বিয়ে হয়?

দশরথের কণ্ঠস্বর জোরাল হল! বলল : আপনি অঙ্গীকারবদ্ধ।

কিন্তু—

কোন কিন্তু নেই! সামনে আমাদের দুরূহ সঙ্কট। অযথা সময় অপচয় করব কোথা থেকে?

আমার আত্মীয়-পরিজন, প্রজা, বন্ধু, ছাড়া তো এ বিয়ে হতে পারে না।

কিন্তু দেবতা ও অসুরের যুদ্ধ ভেরী আমাকে ডাকছে। বিপন্ন দেবতাদের উদ্ধারের জন্য আমাকে এখনই যেতে হবে। কৈকেয়ীও যাবে আমার সঙ্গে, থাকবে আমার পাশে পাশে। এর কোন নড়চড় হবে না।

শম্বর আমার বন্ধু। তার সাহায্যে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমিও দেবতাদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কৈকেয়ীর জন্য যা যা করা দরকার ছিল আমি অঙ্গীকার করেছি। আর কোন দাবি থাকতে পারে না। আপনার সুবিধা-অসুবিধা কোথায় আমি জানতেও চাই না। এ জন্য নতুন কোন সর্তও আরোপ করা চলবে না। কৈকেয়ী আমার বাগদত্তা এখন। তার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমাকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করতে উৎসাহিত করবেন না। এরকম প্ররোচনায় প্রতিজ্ঞা দুর্বল এবং অর্থহীন হয়ে পড়ে। অতএব অঙ্গীকার পালন করে আপনার সত্য রক্ষা করুন।

অশ্বপতির মুখে কথা সরে না। আয়ত চোখের কালো তারা অপলক স্থির বিদ্ধ হয়ে থাকে দশরথের চোখে। দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা নিবিড়, কিন্তু অনুসন্ধিৎসা গভীর। অশ্বপতিকে বেশ চিন্তিত ও বিপন্ন মনে হল। কথা যেন তার বুকের কাছে আটকে রইল। নিঃশ্বাসে তাই তীব্র ব্যথা টনটনিয়ে উঠল। মুখের পেশীতে যন্ত্রণা, কষ্ট। চোখের তারায় কি একটা বলতে না পারা অসহায়তা।

অশ্বপতির কাছে কৈকেয়ীর বিবাহ ছিল নিয়তির এক অমোঘ সংকেতের মতো। আর দশরথকে মনে হয়েছিল কল্পতরু। দশরথের আকস্মিক প্রস্তর কঠিন দৃঢ়তা তার অনুমান ও সিদ্ধান্তের মধ্যে এক সংঘাত সূচনা করল। কিন্তু সাফল্যের গৌরবতৃপ্তি দশরথের মুখের উপর, চোখের অপলক স্থির দৃষ্টিতে একপ্রস্থ রঙের ঔজ্জ্বল্যে দীপ্ত করল। দশরথের ঐ মুহূর্তের অভিব্যক্তি তাকে অধিকতর সুন্দর করল। অশ্বপতি নিজেও মুগ্ধ অভিভূত হলেন। সম্মোহিতের মতো ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন। বললেন : উত্তম। তোমার অভিলাষ, আমার অঙ্গীকার অবশ্যই পূরণ করবো। কিন্তু সত্যরক্ষার নাম করে তুমি যে আমার কতখানি শত্রুতা করলে, এবং কিরূপ কলঙ্কভাগী করলে তা তুমি চিন্তাও করতে পার না। এর দুঃখ অনুতাপ গ্লানি আমার মরলেও যাবে না।

হরপার্বতীর মন্দিরে খুব সংক্ষেপে বিনা আড়ম্বরে দশরথ কৈকেয়ীর পাণিগ্রহণ করল। গুটিকয়েক গণ্যমান্য বক্তি, রাজকর্মচারী এবং রাজপরিবারের লোক ছাড়া আর কেউ ছিল না বিবাহ অনুষ্ঠানে।

সলাজ নম্র কম্পিত দুই-চোখে অনন্ত বিস্ময় নিয়ে কৈকেয়ী দশরথের দিকে তাকাল। দিব্যকান্ত তনু তার যৌবনের সৌন্দর্যে-সমুজ্জ্বল। অনিন্দ্যসুন্দর দীর্ঘ-দেহ অটুট সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী। হাল্কা গোলাপী রঙের পোশাক দশরথকে দর্শনীয় করে তুলল। তার বিশাল চেহারা ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট করে তুলল।

কৈকেয়ীর গভীর চাহনিতে কেমন একটা থমথমে ভাব। শান্ত সুন্দর দুটি চোখের দৃষ্টি দেবমন্দিরের বিস্তীর্ণ অলিন্দে প্রসারিত করে দিয়ে নিজের ভেতর মগ্ন হয়ে গেল।

মেঘের অন্তরাল থেকে যে ভাবে বৃষ্টি ঝরে পড়ে, কৈকেয়ীর অবগুণ্ঠনে ঢাকা দুটি চোখ থেকে তেমনি ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল। বিবাহকালে সব মেয়েরই পড়ে। তারপরেই আবার অশ্রুভেজা মুখে ফুটে ওঠে অদ্ভুত এক আনন্দের অভিব্যক্তি। জীবন রহস্যের সে কথা জানা সত্ত্বেও তীব্র একটা অস্বস্তির কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হল দশরথের অন্তঃকরণ।

ধীর পদক্ষেপে কৈকেয়ীর হাত ধরে এগিয়ে চলল দশরথ। অজানিত একটা আশঙ্কায় তার বুকের ভেতর ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। বাম হাতে ধরা কৈকেয়ীর ডান হাতখানা আরো কাছে টেনে নিয়ে তার দেহের ঘনিষ্ঠ হল। গায়ে গা লাগিয়ে তারা হাঁটছিল। বিশাল দেবভূমির প্রান্তসীমানায় অপেক্ষমান রথের কাছাকাছি হলে ক্ষীণ কণ্ঠে দশরথ অস্ফুটস্বরে বলল : এস এখন আমার হাতে হাত রেখে

ওঠ। পা তোল সাবধানে। আমি হব তোমার রথের সারথী।

কৈকেয়ী যন্ত্রচালিতের মতো রথে উঠল। হাওয়ার বেগে ছুটল রথ। গিরি, বন, কানন নিমেষে দৃষ্টির অন্তরাল হতে লাগল। পশ্চাৎভাগ ধুলোয় আচ্ছন্ন হল। দৃশ্যের পর দৃশ্য সরে যাচ্ছিল, কিন্তু কোন কিছুতেই মন ছিল না কৈকেয়ীর। জড়সড় হয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিল সে। তার চোখের তারার বিষণ্ণ বেদনা থম থম করছিল।

পাশাপাশি দুই নদী শতদ্রু সরস্বতী যেখানে মিশেছে সেই মোহানার মাঝখানে এসে দাঁড়াল দশরথ। ইন্দ্রলোকে যাওয়ার ঐ রাস্তার মুখ অবরোধ করে আছে তিমিরধ্বজ। বিশাল সেনাবাহিনী সর্বক্ষণ সেখানে পাহারা দিচ্ছে। তাদের চোখ এড়িয়ে কিছু করার ছিল না। অতএব ইন্দ্রলাকে যাওয়ার পথ বন্ধ। অগত্যা সৈন্যবাহিনী নিয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না দশরথের। উদ্দেশ্য শম্বরের স্নায়ুর উপর কিছু চাপ বৃদ্ধি করা।

সৈন্যশিবির স্থাপনের জন্য এবং শত্রুর অতর্কিত আক্রমণ ঠেকানোর জন্য নিকটের অরণ্য থেকে বড় বড় গাছ কেটে এনে কাঠের উঁচু প্রাচীর তৈরি করা হলো। প্রাকার ভেদ করে বা ডিঙিয়ে শম্বরের বর্বর সৈন্যেরা যাতে শিবিরে হামলা করতে না পারে সেজন্য প্রাকারের গায়ে গায়ে সৈন্যদের শিবির এবং সেনাপতিদের কক্ষ নির্মাণ করা হল। আর তার সামনে বেশ কিছুটা খোলা জায়গা রাখা হলো, যাতে মুখোমুখি ছোটখাট সংঘর্ষ সৈন্যরা করতে পারে। চতুর্দিক ঘেরা প্রাকারের মধ্যস্থলে দশরথ ও কৈকেয়ীর থাকার গৃহ নির্মিত হলো। সৈন্যশিবির পাহারায় সুবন্দোবস্ত করতে কোন ত্রুটি করল না সেনাপতিরা।

আরো উত্তরে শম্বরের সৈন্য শিবির। ইন্দ্রলোক অবরুদ্ধ করে রেখেছে অর্ধবৎসরের অধিককাল। দুরারোহ উচ্চ পর্বতশৃঙ্গের উপর ইন্দ্রলোক অবস্থিত হওয়ায় সম্মুখ যুদ্ধের সুযোগ পেল না শম্বর। তাই চারদিক থেকে ইন্দ্রলোক অবরুদ্ধ করে তাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করার নীতি নিয়েছিল। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের সব পথ বন্ধ করে দিল। সরবরাহ না থাকলে অস্ত্র, খাদ্যের অসুবিধা একদিন তাদের দেখা দেবেই। সেদিন তাদের প্রতিরোধের শক্তি থাকবে কোথায়? শম্বর শুধু সেই দিনের প্রতীক্ষা করে আছে। এজন্যে যদি অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হয় তবু করবে শম্বর, যতদিন ইন্দ্রের অমরাবতীর প্রাসাদ চূড়াটি মাটিতে ভেঙে না পড়ে ততদিন এভাবেই প্রতীক্ষা করবে তারা।

তবু আত্মসমর্পণের পর্ব ত্বরান্বিত করার জন্য শম্বর তার সৈন্যদলকে নির্দেশ দিল চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম, নগর লোকালয়ের ওপর হামলা করে, অত্যাচারে উৎপীড়নে অধিবাসীদের জীবন যেন জর্জরিত করে তোলে। শম্বরের আদেশ সৈনিকদের বর্বর নিষ্ঠুর করে তুলল। দুর্বল নারীদের ধরে এনে তারা যৌন লালসা চরিতার্থ করল। পুরুষদের নির্বিচারে হত্যা করল। শিশুদের ক্রীতদাস করে রাখল। শম্বরের উৎপীড়ন এখানে থামল না। খেত খামারগুলি পুড়িয়ে দেশে প্রবল খাদ্যাভাব সৃষ্টি করল। গ্রাম জ্বালিয়ে মানুষকে নিরাশ্রয় এবং গৃহহীন করল। জনপদ অবাধে লুটপাট করে তারা স্বদেশে ভাণ্ডার ভরিয়ে তুলল।

অসহায় মানুষের দুর্বিষহ কান্না, বুকভাঙা বেদনা দশরথকে বিচলিত করল। তার বীররক্ত যুদ্ধের উন্মাদনায় নেচে উঠল। প্রতিবেশী দেশের নিরীহ প্রজাদের ওপর শম্বরের পৈশাচিক অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করা অধর্ম। ঘোরতর পাপ মনে হলো। এতে অত্যাচারীর অত্যাচার প্রশ্রয় পায়। প্রতিপক্ষের দুর্বলতা প্রকট হয়। এ ভাবে তার স্পর্ধাকে বাড়তে দেওয়া কাপুরুষতা। সুতরাং স্নায়ু যুদ্ধের উত্তেজনা বৃদ্ধির পরিকল্পনা তার ব্যর্থ হয়েছে। কার্যত এ পথে অসুরকে দমানো যাবে না। একমাত্র মুখোমুখি লড়াইয়ে বর্বরদের উচিত শিক্ষা হবে। তাই সমস্ত বীর আর সৈন্যদলকে জড়ো করে দশরথ বলল : দুর্গত, দুঃখী মানুষের মুক্তির জন্য তোমরা অস্ত্র হাতে তুলে নাও। অশ্ব, রথ সব প্রস্তুত কর। বীর কখন মরতে ভয় পায় না। সম্মুখ রণে মৃত্যু, বীরের একান্ত কাম্য। শম্বরের সৈন্যবাহিনীর

উপর ঝাঁপিয়ে পড় তোমরা। অসহায়, দুর্গত বান্ধব রাষ্ট্রের প্রতিবেশীদের জীবন ও সম্পত্তি শম্বরের হাত থেকে নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত এই সংগ্রাম চলবে। যতক্ষণ না শম্বরের মৃত্যু হচ্ছে, তার সেনাবাহিনীর সমস্ত সৈন্য ধ্বংস হচ্ছে, ততক্ষণ চলবে এই যুদ্ধ। চূড়ান্ত জয় না হওয়া পর্যন্ত আমরা কেউ থামব না। অসংখ্য প্রাণের মূল্যে আমাদের, যুদ্ধে জিততে হবে; এই শপথ হবে আমাদের জেতার মন্ত্র। আমৃত্যু আমিও যুদ্ধ করব তোমাদের সাথে। যুদ্ধের মন্ত্র উচ্চারণ কর। বলো : জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন। দশরথের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ ভেরী বেজে উঠল। সৈন্যরা যে যার যুদ্ধের জন্য তৈরি হল। তারপর বন্যার স্রোতের মতো তারা প্রাকার থেকে নির্গত হলো।

শম্বরের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধে দশরথ ভয়ঙ্কর ভাবে আহত হলো। সেই রথে কৈকেয়ী ছিল তার সহযোগী। শুধু তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং ক্ষিপ্রগতিতে রথ চালনার অসামান্য দক্ষতায় দশরথ সে যাত্রায় প্রাণে বাঁচল।

রক্তে দশরথের শরীর ভিজে গিয়েছিল। ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ হচ্ছিল না। মুখের রঙ তার ফ্যাকাশে হলো। দুই চোখ নিমীলিত। নিথর নিস্পন্দ দেহে প্রাণ আছে কি নেই বোঝা গেল না। বিশাল রথে মৃতবৎ শুয়েছিল। বুকের মৃদু ওঠা নামাতে তার শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া প্রকট হলো। দশরথের এই অবস্থা কৈকেয়ীকে হতবুদ্ধি করল না। সাধারণ রমণীর মতো নিজেকে সে অত্যন্ত বিপন্ন বা অসহায় ভাবল না। চিন্তা বা বিবর্ণ ভয়ে অস্থির হল না। ঠাণ্ডা মাথায় সে তার কর্তব্য স্থির করল! এক্ষুণি দশরথের শুশ্রূষা ও চিকিৎসা আবশ্যক। তাকে অবিলম্বে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নেওয়া দরকার। কিন্তু কে রথ চালাবে? রথের সারথীও ভীষণ জখম হয়েছে। হাত দুটি অকেজো হয়ে গেছে। যন্ত্রণায় দেহ বেঁকে যাচ্ছে। কণ্ঠ দিয়ে একটানা কাতর স্বর বেরোচ্ছে।

শম্বর তাদের দিকে রথ নিয়ে ধেয়ে গেল। অমনি কেমন একটা খিল ধরা ভয়ে কৈকেয়ীর শ্বাস বন্ধ হয়ে এল। তবু এক আশ্চর্য সাহসে নিজেকে সে শক্ত রাখতে চেষ্টা করল। সমস্ত মনোবল সংহত করে, মরিয়া হয়ে রথ চালাতে লাগল। বায়ুবেগে চলল রথ। শম্বরের সাধ্য ছিল না কৈকেয়ীর যন্ত্রচালিত রথের পিছু ধাওয়া করে তাকে ধরে।

শিবিরে বসবাসকালে দশরথ প্রেমবশে তাকে যন্ত্রচালিত রথ চালানোর কলাকৌশল দেখিয়েছিল এবং পাশে বসিয়ে রথ চালনা করতেও শিখিয়েছিল। কিন্তু সে শেখা যে এত ভাল হয়েছিল আগে জানার অবকাশ হয়নি কৈকেয়ীর। আর সে শেখা যে এরকম করে কাজে লেগে যাবে স্বপ্নেও কল্পনা করে নি কৈকেয়ী। সাফল্যের গৌরব তৃপ্তি তার মনে সুখ দিচ্ছিল।

কিন্তু এই অনুভূতি বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। এক লহমার জন্য মনে এসে মিলিয়ে গেল। চোখে তার যুদ্ধের দৃশ্যগুলো ভাসছিল। কত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দশরথ যুদ্ধ করছিল। চোখের পলক না পড়তে দশদিকে আনায়াসে রথ ঘুরিয়ে শত্রুর উপর আক্রমণ রচনা করছিল। এই বিশেষ রণকৌশল একমাত্র অযোধ্যাপতি নেমির ছিল। তার এই আশ্চর্য ক্ষমতা এবং কৃতিত্বের জন্য রথী মহলে সে দশরথ নামে পরিচিত হল। শম্বরের সঙ্গে যুদ্ধে কৈকেয়ী স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেল। এরকম আশ্চর্য যুদ্ধ সে আগে দেখেনি। রথীশ্রেষ্ঠ দশরথ সম্পর্কে তার মনে একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব হল। এরকম একজন বীরের পত্নী হওয়ার জন্য নিজেকে সে সৌভাগ্যবতী মনে করল। সেই সুখ, আনন্দানুভূতি থেকে বিধাতা তাকে বঞ্চিত করবে? এরকম একটা আতঙ্কিত সন্দেহে এবং উৎকণ্ঠায় তার দুই চোখ সহসা অশ্রুসজল হল। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কাঁদল।

অনেকটা পথ এসে থামল বনের ধারে। অচৈতন্য অবস্থায় দশরথ যন্ত্রণায় আঃ! উঃ! করে কাতরাচ্ছিল। কৈকেয়ী তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে তার কষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করল। মমতা উজাড় করে দিয়ে আহত জায়গাগুলোর উপর হাত বোলাল। ক্ষতস্থানগুলো পরিষ্কার করল। ইঙ্গুদি তেল লাগাল। গভীর ক্ষতের রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে কচি দূর্বা পিষ্ট করে চেপে ধরল। পরিধানের বস্ত্র

ছিঁড়ে আঁট করে বাঁধল। বসনের অনেকখানি ক্ষতস্থান ঢাকতে লেগে গেল। তারপর ঝরনার জলে আঁচল ভিজিয়ে দশরথের চোখে মুখে দিল। রক্তমাখা অঙ্গ প্রত্যেঙ্গের শুকনো রক্তের দাগ ঘষে ঘষে তুলল। তারপর সারথির জখম স্থান ভালো করে কাপড় দিয়ে জড়াল।

প্রাথমিক পরিচর্যার কাজ শেষ হয়ে গেলে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বুকের গভীর থেকে উঠে এল। সেবার অনাবিল আনন্দে মনে খুশি খুশি ভাব জাগল। কিন্তু দুশ্চিন্তায় মাথাটা ভার হয়ে থাকল। তাড়াতাড়ি এবং নিরাপদে পিতৃরাজ্যে ফিরে যাওয়ার সমস্যা তাকে ভাবিয়ে তুলল।

দীর্ঘ পথ। বেশ কয়েকদিন লাগল যেতে। কিন্তু কোন পথ কোন দিকে গেছে কিছু জানা নেই তার। একমাত্র ভরসা আহত রথের চালক। তার নির্দেশে চন্দ্রভাগা নদী পার হয়ে কেকয়ের পথ ধরল।

পথের দুধারে গাছপালা দ্রুত পেছন দিকে সরে যেতে লাগল। সামনের আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা রোদ্দুর। কি জানি কেন, সমস্ত আকাশটা যেন তারই মতো উদ্বিগ্ন। শঙ্কায় কাতর।

দশরথের সুস্থ হতে বেশ কয়েক মাসে লেগে গেল। এর মধ্যে কেকয় থেকে অযোধ্যায় তার আহত হওয়ার খবর গেল। মন্ত্রীবর বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র, ধৌম্য'র সঙ্গে দশরথের আরো দুই রাজমহিষী কৌশল্যা এবং সুমিত্রা কেকয়ে গেল।

কৈকেয়ীর স্বামী সেবা, পরিচর্যা, নিবিড় সাহচর্য তাদের মুগ্ধ ও অভিভূত করল। শুধু তাই নয়, কৈকেয়ীর প্রীতি স্নিগ্ধ আচরণ, সেবায়, স্বাচ্ছন্দ্যে, আতিথেয়তায়, অন্তরঙ্গতায় এত আন্তরিক যে কৌশল্যা এবং সুমিত্রার মনে যেটুকু বিরূপতা ছিল তা ঘুচে গেল। মনে হল, কৈকেয়ী ভালবাসার প্রতিমূর্তি। যে ভালবাসা সব কিছু সুন্দর করে দেয় সেই ভালবাসার যাদুমন্ত্রে তাদের সম্মোহিত করল সে। কৌশল্যা, সুমিত্রার অন্তরে সপত্নীগত বিদ্বেষ বিষ আর ছিল না। কিন্তু মনের গভীরে ঈর্ষা তুষের আগুনের মতো জ্বলছিল। কিন্তু অতলান্ত মনের সেই অভিব্যক্তি ছিল না তাদের আচরণে। বরং একটা গৌরববোধ ছিল। আহত স্বামীকে যেভাবে সেবা শুশ্রূষা করে কৈকেয়ী সুস্থ করল সেজন্য কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল তাদের মনটা। কৈকেয়ী নিজগুণে ধীরে ধীরে কৌশল্যা এবং সুমিত্রার অত্যন্ত আপনজন এবং অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। দশরথ এ হেন রূপসীকে পত্নী করে ঠিক কাজই করেছে। কৈকেয়ীর জন্য দশরথকে তারা জীবিত দেখল। এ হল দশরথের বিধিলিপি। ঈশ্বরের অনন্ত করুণায় দশরথ কৈকেয়ীর মতো সর্বকর্ম নিপুণা স্ত্রী-রত্ন লাভ করেছে। এখন বেচারা স্বামী তদের সুখী হোক এটাই তাদের একান্ত কামনা।

অযোধ্যার প্রাসাদে কৈকেয়ী দশরথের সুখদুঃখভাগিনী প্রিয়পত্নী হয়ে জীবন সুরু করল। নবজনম হল তার। সে আর কেকয়ের রাজকন্যা নয়, অযোধ্যার রাজমহিষী।

॥ দুই ॥

কৈকেয়ীকে নিয়ে দশরথ যেদিন অযোধ্যায় ফিরল সেদিন থেকে পক্ষকাল ধরে চলল নববধূ বরণের উৎসব। গোটা নগরীকে উৎসবের রূপ দেওয়া হল। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষের আনাগোনা বেশ কয়েকদিন ধরেই চলল। প্রজারা দেখতে এল তাদের নতুন রাণীকে।

প্রজাদের আনন্দ উচ্ছ্বাসের অন্ত নেই। দশরথ দেবলোকে যুদ্ধ করতে গিয়ে সিংহের মত শিকার করে এনেছে রূপসী কিন্নর কন্যা কৈকেয়ীকে। ভুবনের আলো এসে রাজার প্রাসাদ আলো করে রেখেছে। তার রূপ দেখে রাজা থেকে রাণী পর্যন্ত মুগ্ধ, দাসদাসী, আত্মীয়, পরিজনের মন ভরে আছে তার সুন্দর আচরণে আর মিষ্ট ভাষণে। রাজপ্রাসাদে সর্বত্র খুশির স্রোত বইছে। হৃদয় মাধুর্যে

সে জয় করে নিয়েছে সকলকে। প্রজারাও তার কথা শুনে চমৎকৃত হয়েছে। কৈকেয়ীর একনিষ্ঠ প্রেম এবং সেবার গল্পে তাদের অন্তর ভরে রইল।

প্রজাদের খুশির কথা পরিচারিকা মন্থরা কৈকেয়ীকে জানিয়েছিল। অযোধ্যার প্রাসাদে নতুন পরিবেশে কৈকেয়ীর কোনা অসুবিধা যাতে না হয় সেজন্য কেকয়রাজ একজন চতুরা, প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন বুদ্ধিমতী রমণী, মন্থরাকে তার মন্ত্রণাদাত্রী করেই অযোধ্যায় পাঠিয়েছিলেন। অযোধ্যাবাসীর অন্তরে কৈকেয়ীর হৃদয় মাধুর্য, নতুন রাণীর প্রতি বিস্মিত শ্রদ্ধা, রোমাঞ্চিত গর্ব ও সম্মানকে অনির্বাণ করে জ্বালার জন্য মন্থরা প্রকাশ্য দরবারে জনসমক্ষে উপস্থিত হতে বলল তাকে। নতুন রাণীর বাসনা পূরণ করতে দশরথও প্রকাশ্য দরবারের আয়োজন করল।

রাজপ্রাসাদের বিশাল চত্বরে বিপুল লোকের সমাগম হল। মাথার উপর তাদের নানা রঙের কাপড়ে তৈরি বিশাল চাঁদোয়া। জনতাকে সুশৃংখল রাখতে তক্‌মাধারী রাজপুরুষরা নিয়ন্ত্রণ করছিল।

রাজা রাণী আগমনের সংকেত-বাদ্য বেজে উঠল। তারপর সূচনা হল মধুর সঙ্গীত এবং নৃত্য। অনুষ্ঠান শেষ হলে মঞ্চে এসে দাঁড়াল রাজা রানী। উল্লসিত জনতাকে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে অভিনন্দন জানাল নতুন রানী। প্রজাদের মধ্যে নতুন রাণীকে দেখার জন্য হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলি পড়ে গেল। চিৎকার করে, তারা অভিনন্দন জানাতে লাগল। রাণীমা পরমাসুন্দরী তাদের! তার রূপের কোন তুলনা হয় না। সে অপরূপা। অনন্ত বিস্ময় তার শরীরে। সোনালি নধর আপেলের মতো তার রঙ। নীলোৎপলের মতো স্বপ্নালু দুই আঁখি। সারা অঙ্গ থেকে ঝরে পড়ছে জুঁই'র সুবাস। সেই সুবাসে বাতাসের প্রাণে খুশির নেশা লাগল। তার হিল্লোল ছড়িয়ে পড়ল জনতার অন্তরে।

প্রাসাদ অলিন্দের সংলগ্ন উঁচু মঞ্চে স্বর্ণ সিংহাসনে বসেছিল দশরথ। তার দক্ষিণ পাশে রক্ষিত স্বর্ণ সিংহাসনে কৈকেয়ী আর বাম পাশে কৌশল্যা। আর পিছনের সারিতে ছিল পাত্র-মিত্র পরিজন।

অযোধ্যার সকল লোক জানল, কৈকেয়ীর রূপ রমণীর ঐশ্বর্য। অলঙ্কার তার রূপের শোভা এবং সৌন্দর্য। অঙ্গের দ্যুতি। কৈকেয়ী শুধু রূপবতী নয়, তার গুণেরও শেষ নেই। গুণের জন্যই সে দশরথের এবং অযোধ্যার মনের মতো রানী। কেকয়রাজ অশ্বপতি কন্যাকে সর্বগুণে গুণান্বিত করেছেন। শিক্ষাই কৈকেয়ীকে সবার কাছে প্রিয় করে তুলল। এ কৃতিত্ব কৈকেয়ীর চেয়ে আশ্বপতির অধিক। জনতার মধ্যে এ ধরনের গুঞ্জন মুখে মুখে উচ্চারিত হতে হতে মঞ্চ পর্যন্ত এসে পৌঁছল। কৈকেয়ী সিংহাসনে বসে নিবিষ্ট মনে তা শুনল। বুকের ভেতর কথাগুলো বীণার তারের মতো রিণ্ রিণ্ করে বাজতে লাগল অনেকক্ষণ. বাবার জন্য গর্ব হল তার। বুকখানা আনন্দে ভরে গেল।

নিজের ভাবনায় অন্যমনস্ক হতে গিয়ে অনুভব করল, সে দশরথের নির্জন নিভৃতের কামিনী নয়, কিংবা তার পতিব্রতা পত্নী শুধু নয়, সে এ রাজ্যের রাণী। শুধু সংসার বা প্রাসাদটুকুতে নয়, রাজ্যেরও অনেক দায়িত্ব তার। এ রাজ্য, প্রজা তো তারই। এমন করে নিজের অধিকারের কথা ভাবতে ভাল লাগছিল কৈকেয়ীর। এই ভাবটাই তার কাছে সত্য মনে হল। কারণ মানুষ সারা জীবন ধরে শুধু পাওয়ার নেশায় ঘুরছে। পেয়ে তার সুখ নেই। এক পাওয়া শেষ হতেই আর এক পাওয়ার অকাঙ্খা জাগে বুকে। রাজারও ক্ষমতায় তৃপ্তি নেই. পৃথিবীর অধীশ্বর হওয়ার স্বপ্ন তার দুই চোখে। সাগরে মিশে নদীর সুখ। এর মানে জীবন থেমে থাকে না, জীবন ক্রমাগতই চলে। চলতে চলতে কখনও অচলায়তনে গিয়ে শেষ হয়, আবার কখনও অনন্তে গিয়ে পরিপূর্ণতা পায়। পাওয়াটাই আসল কথা।

নিজের অজান্তে নিজেকে আবিষ্কার করল কৈকেয়ী। আর অবাক হল। এ কোন নতুন দুনিয়া খুলে গেল তার সামনে! হঠাৎ কেন অদৃশ্য দেবতার অমোঘ নির্দেশে এই সব কথা মনে হল তার? কথাগুলো মনে হওয়া থেকে বুকের ভেতর একটা অসহ্য উত্তাপে জ্বালা করছিল।

কে যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল, তার যাত্রাপথের মাঝখানে অচলায়তনের মতো দাঁড়িয়ে আছে কৌশল্যা। সে বাধা উত্তরণের পথ নেই! কৌশল্যা শুধু দশরথের মহিষী নয়, স্নেহময়ী গৃহিণী। প্রাসাদের দাসদাসী এবং কর্মচারীর প্রতি তার সস্নেহে মধুর ব্যবহার, নিপুণ কর্তব্যপরায়ণতা এবং, অতিথি পরিচর্যার জন্য সকলেই হৃষ্টচিত্তে রাণীর প্রশংসা করে। দাসদাসীরা কৌশল্যাকে মান্য করে।

তার নির্দেশ শোনে। তার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। তার মরমী মনের মাধুরী দিয়ে বিশাল সংসারটাকে সাজিয়ে রখেছে ছবির মতো। কোথাও এতটুকু অসংগতি নেই। রাজমহিষী কৌশল্যার সংসার শুধু প্রাচুর্যে ভরা নয়, শ্রীমণ্ডিত। শুধু সংসার আর প্রাসাদে নয় রাজাও তার উপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করে। কৌশল্যাকে ঈশ্বর যেন কর্তৃত্বের দেবী করে পাঠিয়েছে। সে অনন্যা। নারীসুলভ ঈর্ষায় কৈকেয়ীর বুকের ভেতর চিন্ চিন্ করে। সব নারী চায় গৃহে সাম্রাজ্ঞী হতে। কিন্তু কৌশল্যা থাকতে সে সাম্রাজ্য কোথায় পাবে কৈকেয়ী? অনুচিত মুগ্ধতায় তার মস্তিষ্ক পাপে বিদ্ধ হয়। সুন্দর মুখের সুকোমল পেশী শক্ত হয়, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয় ক্রমে। কৈকেয়ী কোন কথা বলল না। পুঞ্জীভূত বাসনার দাহ স্নায়ুতে স্নায়ুতে। কেবল নামহীন ইন্দ্রিয় জোনাকির মত টিপ টিপ করে জ্বলছিল। সেই চকিত আলোর বিন্দুতে তার অনুভূতি নিজের কাছে সাড়া দেয়। সচকিত হয়ে নিজেকে মনে মনে প্রশ্ন করল কেন এমন হয়? এ তার কিসের সূচনা?

অমনি কৈকেয়ীর মস্তিষ্কের অন্ধকার সীমায় এক বিস্মিত জিজ্ঞাসার ঝিলিকে কৌশল্যা ঝলকে উঠল। কী আশ্চর্য সুন্দর স্নেহ আর মমতা দিয়ে কৌশল্যা তাকে বরণ করল। সপত্নীগত বিদ্বেষ, ক্ষোভ, দুঃখ বেদনা, বিতৃষ্ণা, ঘৃণা, ঈর্ষা তার আচরণে প্রকাশ পেল না। কৌশল্যার সংযত শান্ত স্নিগ্ধ গম্ভীর দেবীমূর্তি দেখে কৈকেয়ীর কখনও মনে হয়নি স্বামীর মুখ চেয়ে কৌশল্যা তাকে বরণ করেছিল। বরং জননীর মতো তাকে আপ্যায়িত করল। ভাল ভাল খাবার পরিপাটি করে সাজিয়ে তার সামনে ধরল। পাশে বসে নিজে তার তদারকি করল। সুমিত্রাও পাশে বসেছিল। বসে বসে চামর দোলাচ্ছিল। গোল হয়ে পুরনারীরাও বসেছিল তার পাশে। কত হাসাহাসি, তামাসা, কৌতুক, গল্প তাকে নিয়ে হতে লাগল। মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে বসে বসে অনেক মেয়েলি কথা তার কানে এল। কৈকেয়ী খাচ্ছিল না। কেমন উদাস অন্যমনস্কের মতো মাথা নীচু করে হাত নাড়ছিল। থালার উপর আঙ্গুলের দাগ কাটছিল। কৈকেয়ীর থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে কৌশল্যা দরদী গলায় বলল : বাড়ির কথা ভেবে কষ্ট হচ্ছে তাই না! মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছ বোন, এ কষ্ট তো সইতে হবে। বিয়ের আগে আমারও বাযনা ছিল কত! মাকে ছেড়ে এক তিল থাকতে পারতাম না। এখন সে সব কোথায় গেল, মনেও পড়ে না। দুদিন বাদে তোমারও সয়ে যাবে। সবই কপাল। মেয়েমানুষের জীবনটা বিধাতা এক আশ্চর্য ধাতু দিয়ে গড়েছে। ছেলেবেলা থেকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করে তারপর অন্য লোকের হাতে তুলে দাও। সেই অজানা অপরিচিত মানুষটা তার ভাগ্যবিধাতা। তারই খেয়াল খুশি ইচ্ছার পুতুল। সংসার, ছেলেপুলে ঘরকন্না নিয়ে তার জীবন। এটুকুই তার অবলম্বন। তার জগৎ। তাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে সব রমণী মেতে থাকে, নিজেকে ভুলিয়ে রাখে। নিজের সঙ্গে তার নিজের এই বঞ্চনা প্রতিমুহূর্ত। তাই নিরন্তর একটা বিরোধ লেগে রয়েছে তার মনে, কাজে এবং সংকল্পে।

কৌশল্যার কথাগুলো কৈকেয়ীর মন ছুঁয়ে গেল। এসব অনুভূতি হওয়ার মতো তার বয়স হয়নি। কৌশল্যা তার চেয়ে বয়সে বড়। অনেকদিন স্বামীর ঘর করছে। তার অভিজ্ঞতাও বেশি। কৌশল্যা অনেকদিন ধরে জীবন দিয়ে যা জেনেছে, কৈকেয়ী সেই অভিজ্ঞতা এবং জীবনদর্শনের যোগফল এক মুহূর্তে জানল। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। তবে, এটা বোঝা গেল যে, কৌশল্যা জীবনের প্রতিটি ব্যাপারকে মর্ম দিয়ে অনুভব করে। কেন করে, কে জানে? অনুভব করাতেই বোধহয় তার সুখ। আর কোন নারীর মুখে জীবনকে এত গভীর করে বলতে শোনেনি। এর কারণ, কৌশল্যার বন্দী নারী অন্তরে কোথাও একটা যন্ত্রণা অথবা কষ্ট আছে। না হলে এসব অনুভূতি কেমন করে হল তার মনে? অথচ বাইরে থেকে দেখে মনের এসব দুঃখ, জ্বালা যন্ত্রণা বিক্ষোভের কোন প্রতিক্রিয়া যা তার অনুভূতিতে প্রতিমুহূর্ত ক্রিয়াশীল তার কিছুই অনুমান করতে পারা যায় না। কৌশল্যার উপেক্ষিত কষ্টের চকিত অনুভূতিতে তার বুক টন টন করছিল। কষ্টের মধ্যেই অনুভব করল— কষ্ট দুঃখ, বেদনা বাদ দিয়ে কোন মানুষে বেঁচে নেই। সে নিজেও একটা কষ্টে আতঙ্কে দিনাতিপাত করছে।

এই ভাবনাসূত্রে তার আরো মনে পড়ল, কৌশল্যার পরিতাপিত অন্তরের নিগূঢ় মর্মকথা। বেশ

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর কৌশল্যা পুনরায় বলল : তুমি নতুন। সব জান না। অভিজ্ঞতাও কম। তবু সব জেনে রাখা ভাল, রাণীর ভাগ্যে মেয়ে মানুষের তৃপ্তি সুখ দেয়নি ঈশ্বর।

নিজের অজান্তে প্রশ্ন করল কৈকেয়ী : কেন?

চোখের পাতায় নিবিড় ব্যথার ছায়া ঘন হল কৌশল্যার। বলল : স্বামীকে নিজের করে পাওয়া রাণীদের কপালে থাকে না। পেয়ে হারায় তারা। আর সে হারানো দুঃখ যে কত ভয়ানক তা জান না তুমি।

কৈকেয়ী কোন জবাব দেয়নি। জবাব দেবার মতো কোন কথাই ছিল না তার। দুই চোখ তার বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়েছিল। উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসায় তার মুখ থম থম করছিল।

ঢোক গিলে কৌশল্যা বলল : মহারাজের জীবনে আমি প্রথম নারী। কিন্তু আমিও পাইনি তাঁকে। যেদিন এ প্রাসাদে তাঁর সঙ্গে প্রবেশ করলাম, সেদিন মনে হল স্বর্গ পেলাম। পুরুষের তপ্ত ভালবাসা ধন্য করল আমাকে। এই সুখ, আর আরামের মধ্যে কোন ফাঁকি ছিল না। কিন্তু দুদিন বাদে প্রশ্ন জাগল, এই কি সুখের নমুনা? কিছু কালের ভেতর নতুনের নেশা কেটে গেল। জীবনের ফাঁক ও ফাঁকি ভরাতে ক্রমেই রাজাকে পাওয়া দুর্লভ হল। প্রমোদ কক্ষেই কাটে সারাক্ষণ বিয়ে বিয়ে খেলা করে। তাদের হাজার খেয়াল আর বিলাসিতার মধ্যে বিয়ে, বৌও এক বিলাস। রানী হওয়া একটা বৃহৎ পরিহাস।

কৈকেয়ী, কৌশল্যার মুখের দিকে তাকিয়ে নিবিষ্ট হয়ে কথা শুনছিল। চোখে মুখে তার গভীর আগ্রহের ভাব ফুটে উঠল। কারণ, জীবনের এসব কথা সে জানে না। নতুন শুনছে। তাই তার ভিতরটা একটা ভয়ঙ্কর ভয়ে শক্ত হয়ে গেল। অস্ফুট স্বরে বলল : আমার ভীষণ ভয় করছে।

কৌশল্যা একটু এস্ত হয়। নিবিড় কালো দুই চোখের তারায় এক তীব্র উৎকর্ণতা। নিচু গম্ভীর উদ্বিগ্ন স্বরে বলল : নিজেরও তো প্রয়োজন বলে বস্তু আছে। নিজের প্রয়োজনের বন্ধনটাই মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধন। কিন্তু সে বন্ধন মহারাজের ছিল না। সুন্দরী ললনাদের কণ্ঠলগ্ন হয়ে আছেন সর্বক্ষণ। গৃহিণীর মনের সংবাদ রাখার সময় কোথায় তার? আমরা তাদের আশ্রিত। অনুগৃহীত। ঘর সাজাবার বিলাস দ্রব্য। আমার নারী জন্ম বৃথা। নারী হয়ে পারি না পুরুষকে আকর্ষণ করতে, তাকে কাছে টানতে। ধরে রাখার কিংবা বশ করার মন্ত্রও জানি না। ব্যর্থতার এই দুঃখে মন পোড়ে, হৃদয় জ্বলে। পুরুষের চিত্ত জয়ের শক্তি বিধাতা নারীকে দিয়েছেন। কিন্তু আমায় দেননি কেন? মহারাজকে যাদু করেও রাখতে পারলাম না. হেরে যাওয়ার এই গ্লানিতে মন পোড়ে, বুক জ্বলে। বলতে বলতে কৌশল্যার কণ্ঠস্বর তীব্র আবেগে ভারী হল। চোখের পাতায় উপেক্ষিত অসম্মানের ছায়া সুনিবিড় হল। কৈকেয়ীর কিশোরী প্রাণের মধ্যে অতর্কিতে অপমানের বেদনা এতো গভীর ভাবে বেজেছিল যে, নিঃশব্দে চোখ মুছতে মুছতে সে ওঠে গেল। চকিতবিদ্ধ কষ্ট তাব আচ্ছন্নতাব মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী হল।

কৌশল্যা এমন অনায়াসে কথাগুলো বলল, যে কৈকেয়ী চিন্তাই করেনি। ঘটনার আকস্মিকতায় কৌশল্যার বুকের ভেতর ঝটিতি অজস্র ক্ষোভ জিজ্ঞাসা একসঙ্গে এমনই উথালি পাথলি করতে লাগল যে একটি কথাও সে উচ্চারণ করতে পারল না। নীরব শ্রোতার ভূমিকায় তার কিশোরী মনের আবেগ অনুভূতি লজ্জায় আবিষ্ট হল। নিরালা ঘরের নির্জনতার মধ্যে দশরথ কৌশল্যার সম্পর্ক তীব্রভাবে আবর্তিত হতে লাগল। মনে একটা জিজ্ঞাসা মিশ্রিত অনুভূতি প্রবল হল। দশরথ কৌশল্যার সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর। কিন্তু তাতে প্রেম নেই, আকর্ষণ নেই, আবেগ নেই। এমন কি অধিকারবোধও সংকুচিত। সম্পর্কটা তাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক। সুবিধা আর স্বার্থের। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কতখানি উত্তাপহীন এবং নির্বিকার হলে তবে এরকম অসহায় অভিসম্পাতের মতো মনে হয় নিজের অবস্থাকে। কৈকেয়ীর মস্তিষ্কে কথাটা বিদ্যুতের মতো ছুঁয়ে যায়; অমনি যন্ত্রণা বিদ্ধ এক কষ্টে বুক তার টনটন করে। অনুরূপ আতঙ্কে বিবর্ণ হল তার মুখশ্রী। পেশী শক্ত হল। প্রাসাদে নিজেকে তার ভীষণ একা এবং নিঃসহায় মনে হল। রুদ্ধ অভিমানে সে ঠোঁট কামড়ে ধরল। তারপর, আত্মহারা আবেগে অনেকক্ষণ একা একা কাঁদল। কেঁদে হালকা হল।

নিজের অজান্তে কৈকেয়ী ভাবতে লাগল কৌশল্যা যা যা বলল সব সত্যি? এর একবর্ণও মিথ্যে নয়? তাকে ধোঁকা দেয়ার কৌশল'ও হতে পারে? কর্তৃত্ব রক্ষার স্বার্থে অথবা প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেও কৌশল্যা তাকে ভয় দেখাতে পারে। স্বামী সম্পর্কে কৌশল্যা যে তার মনে একটা ঈর্ষা বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করছে না তার কি প্রমাণ আছে? এ সবই হয়ত কৌশল্যার ছলনা। তার উপর দশরথের আত্যন্তিক আকর্ষণ, টান এবং প্রেম কৌশল্যাকে ঈর্ষান্বিত করছে। তাই দশরথের প্রতি তাকে বিরূপ করার জন্য, তাকে দূরে সরানোর জন্য তার প্রেমে ক্লান্তি আনার জন্য নিজেকে নিয়ে হয়তো সত্য মিথ্যার গল্প বানিয়েছে কৌশল্যা। এ সব সন্দেহ ও সংশয়ে তার চিত্ত ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল। তার সারা মনে গ্লানি জমল। কিন্তু দেহ মনের ক্ষুধা, চাওয়ার তীব্রতা, জয় করার নেশা, নীড় রচনার স্বপ্ন, জীবনের কাছে অনেক চাওয়া পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাকে জীবনের এককূল থেকে আর এক কূলের দিকে প্রবলবেগে টানতে লাগল। তাই, কৌশল্যার কথাগুলো তার চিন্তায়ও মনেতে দীর্ঘস্থায়ী হল না। বলাবাহুল্য এই বোধই তাকে আত্মসচেতন মহিলা করে তুলল। রাজাপ্রাসাদের আলোর রোশনানই, প্রাণের প্রাচুর্য, ঐশ্বর্য, বিলাস, ভোগ সুখের মধ্যে আত্মার কৃচ্ছ সাধন এবং দারিদ্র বেমানান। নিজের সত্তাকে, মনকে পঙ্গু নিঃশেষ করে শুধু বেঁচে থাকার মধ্যে কোন গৌরব নেই। নিঃস্ব শীতের শাসনে নিঃশেষ হয়ে যায় গাছের পাতা। যারা ঝরে গেল তাদের কেউ মনে রাখে না—গাছও না। বাঁচার জন্যে প্রয়োজন আনন্দ আর তৃপ্তি। চরিতার্থতার সুখ। ওই অনুভূতি তার সারা মনে একটা নতুন সুরে জাগল। কৌশল্যার কথাগুলো যদি সত্যি হয়, তাহলে সে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে পালাচ্ছে কি একটা নিবিড় আতঙ্ক আর ঘৃণায়। নিজের কর্তব্য সে করেনি। পত্নীর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। তাই নিজেকেই নিজে ঘৃণা করে। জীবনে কোন পাওয়া কোন তৃপ্তিতে তার অধিকার নেই। তাই শুধু কাঁদে, হা হুতাশ করে। কিন্তু তাদের সে ভুল পথে কৈকেয়ী গেল না। দশরথ তাঁর জীবনে প্রথম পুরুষ। তার স্বামী। তার প্রেম, তার জীবন। তাকে প্রেমে বশ করেছে, সেবায় জয় করেছে। দশরথ তার সব পাওয়ার স্বপ্ন। সারা জীবনের ব্যাকুল কামনা। তার সেই অধিকারের উপর আর কারো ভাগ সে রাখবে না। দশরথ শুধু তার একার। একান্ত নিজের। প্রতিদ্বন্দ্বী তার অসহ্য। কৌশল্যা, সুমিত্রাকে নিজের অজান্তে সে ঈর্ষা করতে লাগল।

নিজের ভাবনায় ডুবে ছিল কৈকেয়ী। আত্মমুগ্ধ সমাধিস্থ ভাব তাকে এমন নিরাসক্ত এবং নির্বিকার করে রাখল যে দরবারে বিভিন্ন ঘোষণা এবং নিয়ম মাফিক কাজকর্ম কিছুই দেখছিল না। জনতার উল্লাস, হর্ষ, কোলাহল, জয়ধ্বনি তার কানে আসছিল, কিন্তু তাতে তার একাগ্রতা নষ্ট হল না। কিংবা তার প্রতি কোন আগ্রহ বা কৌতুহল প্রকাশ পেল না। শূন্যদৃষ্টিতে সে জনতা দেখছিল। তার অন্যমনস্ক ঔদাসীন্যের দিকে তাকিয়ে দূর আকাশে চিকুর হানা চমক লাগল দশরথের মনে। কৈকেয়ী প্রস্তরমূর্তিবৎ, বধির। তার চোখে ছিল একটা নিবিড় যাতনা মেশানো আবেগ।

উৎকণ্ঠায় দশরথের দুই চোখের চাহনি সুনিবিড় হল। রহস্যের সুমুখে একটা গভীর জিজ্ঞাসার ভুরু টান টান, অপলক দৃষ্টি। নিচু স্বরে উচ্চারণ করল ছোট রাণী!

কৈকেয়ী চমকে উঠল। সম্মোহিতের মত সাড়া দিল তার ডাকে। বললঃ হুঁ।

কৈকেয়ী কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে দশরথের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একটু হাসার চেষ্টা করে বলল : কিছু বলবে?

দশরথ মাথা নাড়ল। বললঃ এই দরবার তোমার জন্য। অথচ, তুমি নির্লিপ্ত নির্বিকার ও উদাসীন। এর সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ নেই?

কী করব বল?

দশরথ সেই মুহূর্তে জবাব দিতে পারল না। তার চোখের দিকে তাকাল। তারপর, উদ্ধত বুকের দিকে। দৃষ্টিতে তার অসহায়তা ফুটল। খুব আস্তে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল। এখানে আসার পর থেকে তুমি কেমন বদলে গেছ। কিসের দুঃখ তোমার কাছে বড় হয়ে উঠল, জানতে ইচ্ছে করে। তোমার কষ্ট দেখলে আমারও কষ্ট হয়।

কৈকেয়ী হাসল। ভারী গলায় বলল, দুঃখ নিজে থেকেই অনেক বড়। তার কোন সীমা পরিসীমা

নেই। বুক থেকে উঠে আসা একটা কষ্টের সঙ্গে উচ্চারণ করল। আর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল সেই সাথে।

দশরথ কষ্টে মাথা নাড়ল। ফিস ফিস স্বরে বলল : তোমার কোন দুঃখই থাকবে না একদিন দেখ।

দশরথ ও কৈকেয়ীর কথাবার্তার মধ্যে মন্ত্রীবর বশিষ্ঠ সশরীরে উপস্থিত হল। সবিনয়ে নিবেদন করল: মহারাজ ছোটরাণীর হাত থেকে প্রজারা অন্ন, বস্ত্র, এবং স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণের জন্যে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটু পরিশ্রম স্বীকার করে তাকে একাজ করতে হবে নিজের হাতে। এটাই এ রাজ্যের কুলপ্রথা।

গরিব দুঃখী প্রজাদের অন্ন-বস্ত্র-ধন বিতরণ করতে কৈকেয়ীর বার বার মনে হতে লাগল সে নিজেই এ রাজ্যের অধীশ্বর। অসীম তার ক্ষমতা। এই রাজ্য প্রজা সব তার। সে এর রক্ষক, পালক, শাসক।

গভীর রাত।

পৃথিবী নিস্তব্ধ। রাতের আকাশে তারারা শুধু জেগে। নীচের পৃথিবী ঘুমিয়ে। সকলেই গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন। পাহারা দেবার জন্য কেউ জেগে নেই। প্রাসাদের প্রহরীরাও থামের গায়ে মাথা রেখে আঘোরে ঘুমোচ্ছে।

দশরথ চুপি চুপি তার শয্যা থেকে উঠল। পায়ে পায়ে কৌশল্যার কক্ষের সামনে দাঁড়াল। বন্ধ দরজায় হাত দিতে খুলে গেল। পা টিপে টিপে কক্ষে ঢুকল। কৌশল্যার পালঙ্কের উপর বসল। নিদ্রিত কৌশল্যাকে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। পরিধানের স্বচ্ছ পাতলা বসন নিদ্রার মধ্যে এলোমেলো ও বিস্রস্ত হয়েছিল। আর তার আড়ালে অবারিত হয়েছিল বক্ষবাসের আবরণমুক্ত কোমল, নরম সুডৌল মসৃণ দুটি স্তনভাণ্ড, গুরুনিতম্বে অস্পষ্ট ছায়াভাস এবং কটিতলের উলংগ জঙ্ঘা। খর যৌবনবতী সেই অনির্বচনীয় অনাবৃত সৌন্দর্যের দিকে লুব্ধ দৃষ্টি কামনায় আবিল হয়ে উঠল। আর গলা মোমের মতো তরল স্রোত তার মেরুদণ্ড দিয়ে বইতে লাগল। নিদারুণ উত্তেজনায় দেহমন তার বিবশ হয়ে গেল। রাত্রির সেই মধ্যযামের নিথর নিস্তব্ধতার ভেতর চুপ করে বসে থাকতে থাকতে তার সারা অঙ্গে লাগল কামনার জোয়ার। নদীতটের মত পড়ে থাকা শরীরটা উপর ঢেউর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে দলাই মালাই করতে ইচ্ছে হল। নদী হয়ে তার দেহে মিশে যেতে ইচ্ছে করল। কিন্তু পারল না দশরথ।

তুষারাবৃত পাহাড়ের মতো হিমশীতল আর কঠিন তার দেহ। কেবল আঙ্গুলগুলো লুব্ধ আর মত্ত হয়ে উঠল। পরম আদরে তার বুকে আলতো করে হাত বোলাল।

নিদ্রিত কৌশল্যার স্নায়ুতে তরঙ্গায়িত হযে গেল তার শিহরন। অমনি কৌশল্যা চমকাল। চোখ খুলল। ধড়ফড় করে উঠে বসল ফেননিভ কোমল শয্যায়। সদ্য ঘুমভাঙা দুই চোখে তখনও একটা আতঙ্ক, উদ্বেগ জড়িয়ে ছিল। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে ভুরু, কোঁচকাল। এক অব্যক্ত বিরক্তি, ক্রোধ, ঘৃণা, বিতৃষ্ণা দশরথকে দেখেই যেন থমকে গেল। অবাক চোখ অবাকতর করে সে দশরথের দিকে তাকাল। ঠোঁটে তার ধরা পড়ে যাওয়ার গ্লানিকর লজ্জার আভাস। তার সমগ্র অভিব্যক্তিতে একটি ভীরু অপরাধবোধের আর্তি যেন মার্জনা চাইছিল। কিন্তু তাতেই চল্লিশ বছরের দশরথকে এত সুন্দর লাগছিল যে তাতে ত্রিশ বছরের কৌশল্যার রক্ত থরথরিয়ে উঠল। মুহূর্তে কৌশল্যাকে অন্যরকম লাগল। প্রগাঢ় প্রেমানুভূতির তীব্রতায় জ্বল জ্বল করছিল বয়স্ক দুটি চোখ। দশরথের বুকের খুব নিকটে দাঁড়িয়ে কৌশল্যার বিস্ময়মাথিত স্বর ধ্বনিত হল : তুমি! এত রাতে!

তোমাকে দেখব বলে চুপি চুপি এসেছি। কতকাল পাই না তোমায়। নিভৃতে দুটো মনের কথা বলতে এলাম।

কৌশল্যার বুকের ভেতর অশান্ত সাগরের প্রমত্ত উচ্ছ্বাস। নিজেকে তার কেমন অশক্ত লাগছিল।

মনে হচ্ছিল, একটা কিছু আশ্রয় না পেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। তথাপি, কেমন একটা সহিষ্ণুতায় সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দশরথের দিকে তাকিয়ে বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ধীরে ধীরে বলল রাত্রি এত মধুর, প্রেম এত সুন্দর, আগে কখনও অনুভব করিনি। কতকালের পিপাসাকাতর মরুভূমির ওপর নামল ভরা শ্রাবণের স্নিগ্ধ বর্ষণ। আনন্দের এই অসহনীয় আবেগ আমি রুখব কি করে?

কৌশল্যা মুহূর্তে দশরথের গলা জড়িয়ে ধরল। শরীরের নিবিড় স্পর্শ দশরথের অনুভূতিতে ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করল। আগ্রাসী তৃষ্ণার চুমুকে নিজেকে পরিপূর্ণ দান করার আনন্দের মধ্যে ডুবে গিয়ে কৌশল্যা বলল : ওগো এটা কোন্ ঋতু? ঋতুরাজ বসন্ত কি আমার তিরিশ বছরের জীবনে ফিরে এল? তাই বুঝি পৃথিবীতে এত সবুজের সমারোহ, গাছে গাছে পাখির কাকলি! বসন্তের মলয়ে প্রাণ জুড়োনোর আবেশ। বুকের ভেতর ঝর্নার কলরোল। তাই খোলা চোখে দেখছি নীল আকাশের আকুলি। আজ আমার একি হল? আমি কি জানতাম, আমার সুখের স্বপ্ন এমনি করে পায়ের তলায় অনুগত রাত্রির মতো লুটিয়ে পড়বে?

দশরথের নীরব চোখে তার উদ্বেগ ফুটে উঠেছিল। ভীষণ মৌন এবং গম্ভীর তার মুখ। কৌশল্যার আবেগে ঘোরলাগা আচ্ছন্নতা তার সমস্ত অনুভূতির মধ্যে পাক খাচ্ছিল। আর একটা তীব্র অপমানবোধে তার বুক টাটাচ্ছিল। আপন মনের জটলায় কষ্ট পাচ্ছিল। কেমন একটা অসহায় ক্লান্তিতে ধুঁকছিল। কাঁটার মতো মনের ভেতর খচখচ করে ফুটছিল কৌশল্যার প্রগলভ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীর। তীব্র অসহায় যন্ত্রণায় কৌশল্যা তাকে আঘাত করেছিল। এ তার প্রাপ্য! তবু তার চৈতন্য জুড়ে কৌশল্যার নিষ্ঠুর কৌতুক তাকে ধিক্কার দিচ্ছিল। আস্তে আস্তে নিজের আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে উঠল। কথা বলতে গিয়ে তার ভুরু কুঁচকে গেল। ভীরু চমকানো কষ্ট বিদ্ধ অস্পষ্ট স্বর শোনা গেল তার কণ্ঠে। বলল : মহিষী তোমার বিদ্রূপ বড় নিষ্ঠুর, ব্যঙ্গ ভীষণ নির্মম।

কৌশল্যার দুই চোখে বিভ্রান্ত বিস্ময়। সম্মোহিতের মতো উচ্চারণ করল : আমার সব পাওয়ার মাঝে এমন নিষ্ঠুর হলে কেন মহারাজ? তোমার সামান্য করুণা, সহানুভূতিতে যার জীবন ধন্য হয়ে যেত তাকে অনুগ্রহ দেখালে না কেন? ভুলেই তো ছিলাম। তবে, কেন বসন্তের বার্তা নিয়ে এলে? একি শুধু ছলনা? কিন্তু আমি তো একবারও তা মনে করিনি। স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল রাত্রি। তুমি কেন তালভঙ্গ করলে? কেন স্বপ্ন ভেঙ্গে খান্ খান্ করলে? মুখে তোমার হাসি নেই, চোখে নেই সোহাগভরা দৃষ্টি। কেন? কি হয়েছে তোমার? আমি তোমার সকল দুঃখের সাথী। আমাকে খুলে বল। লুকিয়ো না কিছু।

দশরথ অভিভূত। মনে মনে সে অবাক হয়েছিল এই ভেবে যে কৌশল্যার দুর্জয় ক্রোধ, অভিমান, আক্রোশ প্রকৃতপক্ষে তার ভালবাসার অভিমান। দশরথকে নিজের করে পাওয়ার সমস্থ প্রতিবন্ধকতাকে জয় করার একটা দুর্জয় অভিলাষ কোন না কোন কারণে তার আকর্ষণের মধ্যে সংঘাত বাধাল। এজন্য দায়ী ছিল দশরথ ও কৈকেয়ীর দু'জনের জীবনকে দেখবার ভাববার ভঙ্গী আর চিন্তা। যে পরিবেশের ভেতর তাদের জীবন প্রবাহ স্বাভাবিক হতে পারত দশরথ তার স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। তাই, কৌশল্যার অন্তরে আকর্ষণ বিকর্ষণের সংঘাত নানাবিধ অনুভূতির বিশ্রণে জটিল ও অস্বাভাবিক। এই অসংগতি কৌশল্যার স্বরে রীতিমত বিদ্রূপের মতো বেজেছিল। পরক্ষণে দশরথের বিমূঢ় জিজ্ঞাসা মিশ্রিত অনুভূতি কৌশল্যার মস্তিষ্কে ঝলকে উঠে দপ্ করে নিভে গেল। বুক তার তীব্র অনুশোচনায় হাহাকার করে উঠল। কৌশল্যা সম্পর্কে দশরথের এই অনুভূতি তার মনের মধ্যে পাক খেতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত তাই কথা বলতে পারল না দশরথ। খানিকটা অসহায়ভাবে ডাকল : মহিষী!

রাজা! দুরন্ত আলিঙ্গনে আমকে একটু কাছে টেনে নাও। বল, আমি তোমার। চিরকালের মতো তুমি আমার।

উতলা হয়ো না রানী। দশরথ তোমারই থাকবে। শরতের মেঘ মাঝে মাঝে ঢেকে দেয় সূর্য। কিন্তু সেটা সাময়িক।